জরাসন্ধ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৭১

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীবিভূতিভূষণ রায়
বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
অজিত গুপ্ত

দাম : পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

শ্রীমতী রচনা চক্রবর্তী
কল্যাণীয়াসু

॥ এক ॥

অঞ্চলটা নতুন গড়ে উঠেছে। শুধু চেহারায় নয়, নামেও তাঁর পরিচয়—নিউ সাউথ পার্ক। দক্ষিণ কোলকাতার আরো খানিকটা সম্প্রসারণ।

পীচঢালা রাস্তাগুলো জ্যামিতিক সরল রেখার মত সোজা। উপনগরীর ঠিক মাঝখান দিয়ে যেটা চলে গেছে, পূব থেকে পশ্চিমে, সেটা বেশ চওড়া, বোধহয় ষাট ফুট। তার নামকরণ হয়েছে ;—কী একটা অ্যাভিনিউ, যদিও তার দুধারে কোথাও গাছপালার চিহ্ন নেই। হয়তো পরে লাগানো হবে। শুরু থেকেও তো হতে পারত। হয় না। নগর-পত্তনের পরিকল্পনায় ওটা অবাস্তব। স্থপতির ব্লু-প্রিন্টে বৃক্ষের স্থান নেই।

আগেকার দিনে 'জলাশয়-খনন' 'বৃক্ষরোপণ'—এসব ছিল গৃহস্থের পুণ্য কর্ম। রাজারা যখন রাজপথ তৈরী করতেন তার দুধারে থাকত ঘনপল্লব বৃক্ষের সারি। তারা পথচারীকে ছায়া দিত, দূরাগত শ্রান্ত পথিককে বিশ্রাম দিত, ফলের দিনে কিঞ্চিৎ আহারও দিত সেই সঙ্গে। শুধু পথচারী নয়, আকাশচারী মেঘলোকের সঙ্গেও তাদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘায়ত শ্যামল তরুবীথিকার স্নিগ্ধ আহ্বানে বিগলিত হয়ে কোনো কোনো চলমান মেঘ নিজেকে রিক্ত করে বিলিয়ে যেত তার দাক্ষিণ্যের ধারা। আকাঙ্খিত বর্ষণে তৃপ্ত হত ধরণী। মাঠে মাঠে চাষের মরসুম শুরু হত।

কালক্রমে মানুষের পুণ্য-লোভ আর তেমন প্রবল নেই, পুণ্যার্জনের পথও বদলে গেছে। রাজরাজরাও নেই, তার জায়গা নিয়েছে রাজ-সরকার। নগর-পত্তন, রাজপথ-নির্মাণ, দীর্ঘিকা-খনন

—এসব কর্ম চলে গেছে সরকারের হাতে। তার মধ্যে পুণ্যের প্রেরণা নেই, সবটুকুই প্রয়োজনের তাড়না। পাইটি নয়, ইউটিলিটি।

সম্ভবতঃ সেই কারণেই পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে পদ্মা-ভাগীরথীর শ্যামলিমায় ঘেরা যে ভূখণ্ড, সেখানে সহর বসাতে গিয়ে তার রাস্তার ধারে গাছ বসাবার দিকে তেমন ঝোঁক দেখা যায় না। প্রকৃতি এখানে হরিদ-বর্ণা ; পথে প্রান্তরে, লোকালয়ে সবুজের সমারোহ। মানুষের প্রকৃতি তার প্রতি অনেকটা উদাসীন। অন্তত তার উপরে এমন কোনো মোহ বা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে না, যার ফলে 'বৃক্ষ-রোপণ' বলে একটি প্রয়োজনীয় আইটেম্ বা দফা নতুন নতুন নগর-পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হতে পারে।

পশ্চিমাঞ্চলের কথা আলাদা। সেখানকার গৈরিক প্রকৃতির সারা দেহে সবুজ-স্নিগ্ধতার একান্ত অভাব। তার মাটি রুক্ষ, বাতাস শুষ্ক, আকাশ বর্ষণ-বিমুখ। তার পাথুরে ডাঙ্গায় গাছপালা, লতাগুল্ম দূরে থাক, ঘাস পর্যন্ত গজায় না। বৃক্ষ সেখানে বৃক্ষ-সম্পদ। ঝোপ ঝাড় সেখানে আপদ নয়, শ্রী। সেখানকার মানুষের মনে গাছের একটা বিশেষ স্থান আছে। তাকে তারা যত্ন দিয়ে, শ্রম দিয়ে গড়ে তোলে, কষ্ট করে বাঁচিয়ে রাখে। রাস্তা বানাতে, বাড়ি তুলতে গিয়ে ওখানকার স্থপতিরাও তাকে বাদ দিতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ যে 'বৃক্ষ-রোপণ'কে একটি বিশেষ উৎসবের রূপ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর কবি-প্রকৃতির প্রেরণা অবশ্যই ছিল, সেই সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদটাও অস্বীকার করা যায় না। একথা অন্তত মানতে হবে, যে 'অঙ্গনে' তিনি 'বালক তরুদলকে' নৃত্য-গীতের অঞ্জলি দিয়ে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেটা যদি শান্তি-নিকেতনে না হয়ে বরিশালে হতো, তাঁর শিল্পীরা হয়তো অতটা উৎসাহিত হতেন না, ঐ উৎসবের পিছনে আশ্রমবাসীদের প্রাণের সাড়া যে কতটা পাওয়া যেত, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

নিউ সাউথ পার্কে প্রধান রাস্তা ঐ একটি। বাকীগুলো কম

চওড়া—বোধহয় তিরিশ ফুট—দু'দিক থেকে আড়াআড়িভাবে ওর সঙ্গে এসে মিশেছে। তাদের কোনো নাম নেই। দু'ধারে সরু ফুটপাথ। তার পাশে বিচিত্র গেট-ওয়ালা বাড়ি। কোনো কোনোটার সামনে একফালি বাগানও আছে, ফুল, লতা, পাতা-বাহারের বাগান। মাঝে মাঝে খালি প্লট। এখানে সেখানে নতুন বাড়ি উঠেছে, গায়ে ভারা বাঁধা, চারধারে ইট, খোয়া, বালি আর পাথর-কুচির স্তূপ।

যে-রাস্তায় পাশাপাশি সব প্লট ভর্তি হয়ে গেছে, সেখানেও বাড়িগুলো পুরনো কোলকাতার মতো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁক, প্রচুর আলো বাতাসের অবাধ পথ। ফাঁকগুলো হয়তো শুধু সেই উদ্দেশ্যেই রাখা হয়নি। এখানে যাঁরা থাকেন, ওগুলো তাঁদের স্বভাব ও মেজাজের প্রতীক। এরা যে-তলার লোক, প্রতিবেশীর সঙ্গে 'মেলামেশাটা' সেখানে রেওয়াজ নয়। তার থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বাঁচিয়ে চলাই এঁদের জীবন-দর্শন।

বাড়িগুলোর আকার, গড়ন এবং নক্শা আলাদা হলেও, একটা বিষয়ে আশ্চর্য মিল আছে। প্রায় প্রতিটির সামনে চওড়া বারান্দা এবং তার ধারে নয়, অনেকটা মাঝ বরাবর একটি করে কালো মোটা পিলার একতলার ছাদ ফুঁড়ে দোতলা বা তিনতলা পর্যন্ত উঠে গেছে।

সুহৃদ রুদ্র যেদিন স্ত্রীকে সঙ্গে করে এই পল্লীতে ফ্ল্যাট খুঁজতে এসেছিলেন, মালতী ঐগুলো দেখিয়ে এঞ্জিনিয়র স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আজকালকার বাড়ির প্ল্যানে বুঝি ওই রকম একটা পিলার ঢোকানো নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে?

অন্তত এ পাড়ায় তাই।

কেন?

ওগুলো হচ্ছে পিলারস্ অব্ সাক্সেস্। জীবনে এঁরা জয়ী হয়েছেন, তারই চিহ্ন। অর্থাৎ, বলতে পার জয়স্তম্ভ।

পিলারের এই দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনে মালতী হাসলেন। চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, কিন্তু সব গুলোই কালো তা দেখেছ ?

সুহৃদও সেটা লক্ষ্য করলেন। বাড়ির রং আলাদা আলাদা হলেও পিলারগুলো সত্যিই কালো। তাঁর স্থপতি-দৃষ্টিতে মনে হল কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য রং হলে মানাত ভালো। বললেন, তুমি বলতে চাও, জয়স্তম্ভ যদি, তবে অশোক-পিলারের মত ব্রাউন কেন হল না ?

—তা নয়, তবে কালোটা বড্ড একঘেয়ে লাগছে না ?

সুহৃদ চলতে চলতে মাথা নিচু করে কি ভাবলেন। তারপর গম্ভীর মুখে বেশ খানেকটা গবেষণার ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন, ওরও একটা মানে আছে।

—কী, শুনি ? মালতীর চোখে কৌতুক দৃষ্টি।

ঐ কালোটা হচ্ছে সিম্বল, বাংলায় যাকে বলে প্রতীক। মানে, এই বাড়িওয়ালাদের সকলের না হলেও, অনেকের জীবনে সাক্‌সেস্‌ যে পথ দিয়ে এসেছে, তার রংটা ঐ।

মালতীর ভ্রূর উপরে কুঞ্চন দেখা দিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, তার মানে এটা ব্যবসাদারদের পাড়া ? তাহলে এখানে এসে কাজ নেই, বাপু।

"এ তোমাব ভারী অন্যায়", তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যেন প্রতিবাদ করছেন এমনি সুরে বললেন সুহৃদ, "শুধু ব্যবসাদাররাই বুঝি কালো রাস্তায় চলে ? এর-মধ্যে অনেকে ছিলেন সরকারী কিংবা মার্চেন্ট আফিসের বড় বা মেজো সাহেব। তাছাড়া উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, প্রফেসর—কোনো প্রফেশনই বোধহয় বাদ পড়বে না। কালো পথটা কারো একচেটে নয়।

মালতী প্রতিবাদ করেননি, স্বামীর মতে মনে মনে সায় দিতেও পারেননি। তাঁর ধারণা—কালো বাজার, কালো টাকা, এই

কথাগুলো যেখানে খাটে বা চলে, সেটা হচ্ছে কারবারীদের জগৎ। তিনি দেখেছেন, তাঁর মুদী, মনোহারী দোকানদার, সবজিওয়ালা, মাছওয়ালা যখন খুশি দাম চড়িয়ে দেয়, গয়লা কখনো দুধে জল মেশায়, কখনো জলে দুধ মেশায়, যে শাড়িখানা ক'দিন আগেও তিরিশ টাকা দিয়ে কিনেছেন, আজ তারই দাম হাঁকছে পঁয়ত্রিশ টাকা। এইগুলো কালো বাজারের রোজগার, গৃহস্থকে ঠকিয়ে অতিরিক্তি মুনাফা লোটা। সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এক বেলার মধ্যেই তো একটা দাঁতের মাজন এক টাকা থেকে লাফ দিয়ে দেড় টাকায় গিয়ে উঠতে পারে না। ওটা ওদের অন্যায় লাভ। ওদের উপরের স্তরে যারা রয়েছে, মানুষের নিত্য-ব্যবহারের জিনিসপত্র যারা তৈরি করে, কিংবা দোকানে দোকানে যোগান দেয়, —বড় বড় কারবারী এবং কলকারখানার মালিক—তাদের এই অসঙ্গত মুনাফার সুযোগ রয়েছে। সে সুযোগ তারা নিচ্ছে এবং অন্যকে করে দিচ্ছে বলেই দোকানদাররা তার উপরে খানিকটা করে ভাগ বসাচ্ছে। কোথা দিয়ে কী ভাবে কে কতটা লুটছে, অতসব ব্যাপার মালতীর জানা নেই। কিন্তু উপর থেকে তলা পর্যন্ত এদের গোটা দলটাই যে এই কালো রোজগারের পথ বেয়ে ওঠা-নামা করে, এ-বিষয়ে তাঁর একটা মোটামুটি বিশ্বাস জন্মে গেছে। তার থেকে 'ব্যবসা' নামক বস্তুটির প্রতি তাঁর মনোভাব ঠিক বিরূপ না হলেও অনুকূল নয়।

কিন্তু তাঁর স্বামীর মতো যারা কোন আফিস বা প্রতিষ্ঠানে বাঁধা মাইনের চাকরে, কিংবা যারা ডাক্তারি, প্রফেসরি, ওকালতির মতো একটা সৎ এবং সম্ভ্রান্ত বৃত্তি আশ্রয় করে মেধা বুদ্ধি এবং শ্রমের বদলে অর্থ উপায় করেন, তাদের বেলায় 'কালোবাজার' বা 'কালো-টাকা'—এই কথাগুলো কি করে খাটতে পাবে, তিনি বুঝতে পারেন না। কোনো কোনো চাকরিতে অবশ্য 'ঘুষ' বলে একটা বাড়তি এবং গোপন রোজগারের পথ আছে, একথা তিনি অনেকের মুখে

শুনেছেন। হয়তো আছে, কিন্তু সে আর কটা? তার সংখ্যা যেমন কম, সুযোগও তেমন বেশী নয়।

তাঁর এক পিসেমশায় যেখানে চাকরি করেন, সেখানে নাকি কথায় কথায় ঘুষ। বাড়িতে বলতে শুনেছেন, উনি ডান হাত দিয়ে, সই করে আর কত পান? তার অনেক বেশি আসে বাঁ হাত দিয়ে বিনা সইয়ে। যদি সত্যিই তাই আসে, সেটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। সেই ছোট থেকে তো দেখছেন তাদের। হঠাৎ ফেঁপে ওঠাব কোনো লক্ষণই চোখে পড়েনি। কিন্তু তাঁদের গলির মোড়ের ঐ বাবুলাল সাধুখাঁ? এই সেদিনও খোলার ঘরের মাটির দাওযায় বসে ষ্টীলেব পেয়ালায় চা খেত। যুদ্ধের বাজারে লোহার দৌলতে ক'মাসের মধ্যে আঙুল ফুলে কলাগাছ! তিনতলা বাড়ি, তুখানা গাড়ি। একটা মেয়ের বিয়েতেই কম করে তিরিশ হাজাব টাকা খরচ করেছে। আরো তিনটি বাকী। কালো টাকা না হলে এমন করে রাতারাতি লাল হওয়া যায় না। আর, তার মসৃণ-পথ যদি কোথাও খোলা থাকে সে হচ্ছে ঐ ব্যবসা।

সে যা-ই হোক, নিউ সাউথ পার্কের বাড়িগুলোর পিছনে কালো বা সাদা যে-টাকাই থাক, অঞ্চলটা স্বামী-স্ত্রী তুজনেরই ভালো লেগেছিল, এবং কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পর ওখানেই একটা ছোট ফ্ল্যাট পেয়ে গিয়েছেলেন। খাস কোলকাতার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়েরা বিশেষ উৎসাহ দেননি, কেউ কেউ বরং এদিকে না আসতেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। একজন বলেছিলেন খুব খোলা-মেলা তো বুঝলাম, কিন্তু শুধু আলো আর হাওয়া খেয়ে যেমন পেট ভরে না, তেমনি মনও ভরে না। কথা বলবার মতো তুটো একটা মানুষের মুখ দেখতে না পেয়ে প্রাণটা যখন হাঁপিয়ে উঠবে, তখন করবে কি?

'যা মনে করছেন, তা নয়,' বক্তার ভুল ধারণাটা শুধরে দিতে চেয়েছিলেন মালতী, 'চারদিকে অনেক বাড়ি উঠে গেছে এর মধ্যে। মানুষ জনের অভাব নেই।'

মানুষ! ভুল করছ। ওরা মানুষ নয়, মামী। তোমার দিকে ড্যাব্‌ড্যাব করে তাকিয়ে দেখবে, কথা বলবে না।

বেশ তো, আপনারা যাবেন মাঝে মাঝে। ছুটিছাটা দেখে আমরাও অসবো।

একজন প্রৌঢ়া আত্মীয়াকে অমনি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবার অনুরোধ করতেই তিনি চমকে উঠেছিলেন, 'ও সর্বনাশ! সে-তো শুনছি অনেক দূর। একদিনে ফিরে আসা যাবে তো?'

খাস কোলকাতার এই নিজস্ব রূপটি মালতীর আগে থেকেই চেনা। শ্যামবাজার-বাগবাজার-দর্জিপাড়া-হাটখোলা নিয়ে এদের জগৎ। তার বাইরেটা এদের কাছে দুস্তর ও দুর্গম। সেখানে যেতে হবে শুনলেই চোখে-মুখে এমনি আতঙ্ক ফুটে ওঠে।

প্রৌঢ়ার কথায় কৌতুক বোধ করেছিলেন মালতী। বলেছিলেন, একদিন কেন, এক বেলাতেই ফেরা যায়। আর না গেলেই বা কী? একটা দিন না হয় থেকেই এলেন আমাদের কাছে। জলে তো আর পড়বেন না। জঙ্গলের ভয়ও নেই।

কি জানি বাপু, বাবার বয়সে ও-সব জায়গা কখনো দেখিওনি নামও শুনি নি।

বাইরে থেকে যতটা শুনেছিলেন, এ-পাড়ায় এসে দেখলেন তার কিছুটা অমূলক এবং অনেকখানিই অতিরঞ্জিত। ওরা যাদের 'মামী' বলেছিলেন, পুরনো কোলকাতার অলিগলিতেও তাদের অভাব নেই। বছরের পর বছর ধরে, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বংশ পরম্পরায়, প্রতিবেশীর সঙ্গে তাদের একমাত্র সংযোগ ঐ দৃষ্টির লেহন। তার সম্পর্কে কৌতূহলের অন্ত নেই। হাঁড়ির খবর নেবার দিকেও প্রবল আগ্রহ, কিন্তু রসনার অর্গল কখনো খোলে না।

এই চাপা-ওষ্ঠ এবং চক্ষুদ্বারা-লেহনকারী বিচিত্র জীবটি নতুন গড়ে-ওঠা দক্ষিণের বিশেষ দান নয়, এই মহানগরীর সাধারণ ফসল।

কোলকাতার জলহাওয়ায় আপনা থেকে জন্মায়, অঞ্চল ভেদে উৎপাদনের হার কিছুটা বেশি কম, এই পর্যন্ত। কোনো পাড়ায় এদের নাম 'স্নব', কোনো পাড়ায় 'উন্নাসিক'। আখ্যা দুটো উত্তর দক্ষিণ নির্বিশেষে অনেকের সম্বন্ধেই খাটে।

মুখ-না-খোলার একটা কারণ যে ঐ জাতীয় মনোভাব, সেটা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে আসল বাধা হলো, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রেক দি আইস—কে আগে এগিয়ে আসবে, কার ঠোঁট আগে খুলবে। বরফ ভাঙার দুরূহ কাজটি দু'পক্ষের কেউ একবার করে ফেললেই আলাপ-সালাপ, মেলামেশার দরজা খুলে গেল। পরের ধাপগুলো তখন সহজ ও স্বচ্ছন্দ।

তবে একথা নিশ্চয় মানতে হবে মেলামেশার প্রবৃত্তিটা সমাজের সব স্তরে সমান নয়। যতক্ষণ মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, আমি আমার আশ-পাশ থেকে আলাদা নই, অন্ততঃ মনে হবে না, আমি আলদা। উঁচুতে উঠলেই অনুভব করি আমি সকলের থেকে স্বতন্ত্র। যত উপরে উঠব, ততই সে স্বাতন্ত্র্য-বোধ প্রবল হয়ে উঠবে। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক নিয়মও মোটামুটি তাই।

ছোট দোতলা বাড়ির উপরের ফ্ল্যাটটি মালতীদের। একতলার সামনের দিকে পাশাপাশি দুখানা দোকান ঘর, পিছনের বাকী অংশটা নিয়ে আছেন বাড়ির মালিক, অর্থাৎ ল্যাণ্ড-লর্ড, যদিও চেহারায় বা জীবনযাত্রাব লর্ড-শিপের কোনো লক্ষণ নেই। পৈতৃক বাড়ি ছিল মেডিক্যাল কলেজের পশ্চিমে একটা কোন্ গলির মধ্যে। সারাজীবন রেল অফিসে চাকরি করেছেন। শুরু করেছিলেন কনিষ্ঠ কেরাণী হয়ে, যখন শেষ করেন তখনো বড় বাবুর গদি পর্যন্ত উঠতে পারেন নি। বুড়ো বয়সে অবসর নেবার পর দেখলেন, বাড়িটার অবস্থাও অবসর নেবার মত। ছাত জীর্ণ, দেয়ালে বড় বড় ফাটল, জানালার খড়খড়িগুলো মাঝে মাঝে উধাও, বারান্দার রেলিং ভেঙে পড়ছে।

টা

পেন্‌সেন্‌ নেই। সম্বলের মধ্যে প্রভিডেন্টফাণ্ডের কয়েক হাজার টাকা। তা দিয়ে মেরামতের কাজটা চলে যেতে পারে। কিন্তু তারপর ? মাথার উপর একটা আশ্রয় হলেই তো চলে না, তার সঙ্গে পেটে পুরবার মত কিছু আহারও চাই। সেটা আসবে কোত্থেকে ? বাকী জীবনের-মত ঐ পুঁজিটুকুই ভরসা। ছেলে নেই, তিনটি মেয়ে। বড় দুটি আগেই কোন রকমে পার করেছেন। ছোটটি এখনো ঘাড়ে। তার উপরে নিজেরা দু'জন, এবং ফাউ হিসাবে একটি বাপমা-মরা ভাগ্নে।

ধার-দেনাও ছিল কিছু কিছু। সব তাকিয়ে আছে ফাণ্ডের ঐ নোট ক'খানার দিকে। তাই হাতে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো চোখ বুজে পোষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক পাশে পাশ বই, আর এক পাশে একটুকরো সাদা কাগজ নিয়ে যখন বসে বসে হিসাব করছেন, কোন দাবিটা আগে আর কোন দাবিটা পরে মেটানো যায়, কোন্‌ দফায় কী পরিমাণ অঙ্কপাত করলে মাথাটাও বাঁচে, সেই সঙ্গে আসন্ন অনশনের কবল থেকেও বাঁচা যায়, তখন নিতান্ত দৈবক্রমে একখণ্ড ছাপানো কাগজ এসে তাকে এই দুটো সমস্যা থেকেই বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

"নোটিসটা যখন পেলাম, বুঝলেন, মিসেস রুদ্র" বিশ্বনাথ সরকার তার নিজের ফ্ল্যাটে বসে শোনাচ্ছিলেন মালতীকে, "বার বার পড়েও" মানে বুঝতে পারি না। মানেটা যখন কোন রকমে বোঝা গেল, তখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, যে আমার এই ভাঙাবাড়ির জন্যে এত টাকা দিতে চাইছে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্‌ট ! কী করবে ? ওদেরও যে গরজ। মস্ত বড় রাস্তা বেরোচ্ছে। চোরঙ্গী থেকে বাগবাজার। অনেক বাড়ি ভাঙতে হবে। বড় বড় বাড়িওয়ালারা তো বসে পড়ল। তাদের চেষ্টা হলো নোটিস কী করে রদ্‌ করানো যায়। কেউ মোটা টাকা দাবি করে বসল, কেউ বাপ-দাদার আমলের ঠাকুর দালান ভাঙা চলবে না বলে

আপত্তি জানাল। ধর-পাকড়, তদ্বির-তদারক কি রকম চলল, সে-তো বুঝতেই পারছেন। শুনছি, আর ভয় হচ্ছে—এদের চাপে পড়ে স্কিমটাই না বন্ধ হয়ে যায়। এ-আমল হলে কী হতো বলা যায় না। ভাগ্যিস সেটা ইংরেজের আমল। বন্ধ হলো না।"

• "তখন এখানটায় ছিল ফাঁকা মাঠ, কাঁটা ঝোপ, আর মাঝে মাঝে ডোবা। নতুন টাউনশিপ তৈরী হচ্ছে শুনে খোঁজ-খবর নিয়ে, হাতে যা ছিল তাই দিয়ে কিনে ফেললাম চার কাঠা। খুব সুবিধে দরেই পেলাম। তারপর ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টেব টাকাটা হাতে আসতেই শুরু করলাম বাড়ি। মাল-পত্তর হাতের কাছেই পাওয়া গেল। কণ্ট্রোল-ফণ্ট্রোলের বালাই তখন ছিল না। বিশেষ কোনো বেগ পেতে হয়নি।

"উনি কিন্তু বারণ করেছিলেন, (গৃহিণীকে দেখিয়ে দিলেন) আমি শুনিনি। নিজের চোখেই তো দেখলাম, এই সেদিন পর্যন্ত রাসবিহারী এ্যাভিনিউ আর তার আশপাশ জুড়ে ছিল শুধু ধান ক্ষেত আর বড় বড় পুকুর। কটা বছরের মধ্যে কি হয়ে গেল! তেমনি এ জায়গাও পড়ে থাকবে না। এখন দেখুন!"

বেশ গর্বের সঙ্গে বাইরের দিকটা দেখিয়ে দিলেন বিশ্বনাথবাবু, যেন এই দ্রুত উন্নতির পিছনে যে কৃতিত্ব, সবটুকু না হলেও, অনেকখানি তাঁর।

"উনি যাই বলুন," যোগ করলেন সরকার গৃহিণী "আমার কিন্তু বড্ড ভয় ছিল মনে। ঝোঁকের মাথায় হুট্ করে কিনে তো বসলেন এতটা জায়গা, যদি লোকজন না আসে, পাশে বাড়ি-ঘর না ওঠে, এই মাঠের মধ্যে থাকব কেমন করে? জানো ভাই, একতলাটা খাড়া হতেই আমরা যখন উঠে এলাম, তখন ঐ রান্নাঘরের পেছনে শেয়াল ডাকত। ঐ দূরে দূরে দু-একখানা করে বাড়ি উঠছে। দিনের বেলা যদি বা দু-চারটা মানুষজনের মুখ দেখা যায়, সন্ধ্যা

হতে-না-হতেই রাস্তা-ঘাট একেবারে ফাঁকা। আর কি অন্ধকার! লাইট তো এল এই সেদিন। তার ওপরে আরেক বিপদ—ফী-রাতে চুরি। ঠাকুরের আশীর্বাদে আমাদের অবিশ্যি কিছু নেয়নি।

—নেবার মত কিছু পেলে তো নেবে?

'শোন কথা' স্বামীর মন্তব্য শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালেন সরকার জায়া, "আর কিছু না থাক, দু-একখানা জামা-কাপড়' কি দু-চারটে ঘটি-বাটিও তো নিতে পারত। সে-ই কি কম নাকি? গেরস্তের ঘরে যা যায় তাতেই লোকসান। কি বল?

"সে তো নিশ্চয়ই;" সমর্থন জানালেন মালতী, "এখন বোধ হয় আর সে সব ভয় নেই।"

—না, এখন আর শুনতে পাই না। দেখতে দেখতে কত বাড়ি উঠে গেল। চারদিকে লোকজন গিজ-গিজ করছে।

"গিজ-গিজ করছে, না, আরো কিছু"—সরকারদের ছোট মেয়ে অঞ্জলি চুপ করে ছিল, এবারে আর না বলে পারল না। "সন্ধ্যে হতে না হতেই মনে হবে মাঝরাত। রাস্তাগুলো খাঁ খাঁ করছে। ধারে কাছে না আছে একটা সিনেমা, না আছে দুটো দোকান-পশার। এর চেয়ে গাঁয়ে গিয়ে থাকলেই হয়? আচ্ছা বলুন তো মাসীমা, এখানে কারো মন টেকে?

"আমার সুবীরও ঠিক ঐ কথা বলে," সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে বললেন মালতী, "একদণ্ড বাড়ি থাকতে চায় না। এখন থেকেই ছটফট করছে, একটা বছর কবে কাটবে, তারপরেই শিবপুরে গিয়ে ভর্তি হবে।"

—ওখানে কোথায় থাকবে?

—হস্টেল আছে। সব ছেলেকেই সেখানে থাকতে হয়।

বিশ্বনাথবাবু বললেন, ও-ও বুঝি বাবার মত ইঞ্জিনীয়ার হবে?

—ওঁর তো তা-ই ইচ্ছে। ছেলের নিজেরও ভীষণ পছন্দ। আমার কিন্তু ও-সব লাইন একেবারেই ভালে লাগে না। বাড়ির প্রথম

ছেলে। আমার ইচ্ছে ছিল, লোহালক্কড় না ঘেঁটে লেখাপড়া শিখুক।

বিশ্বনাথ হেসে ফেললেন, ও-সব বিদ্যা বুঝি আপনি লেখাপড়ার দলে ফেলেন না? অবিশ্যি, সেই ধারণাই ছিল আমাদের দেশে। এখন সব পাল্টে গেছে। সায়েন্সের যুগ। ঠিকই করছেন সুহৃদবাবু। করে খেতে হলে টেকনিক্যাল লাইন ছাড়া উপায় নেই। বি-এ এম-এ পাশ করে কী করবে?

—ছোটটার ঝোঁক আবার সেই দিকে। ইংরেজীতে এম-এ পাশ করে প্রফেসার হবে, রিসার্চ করবে। আপনাদের আশীর্বাদে পড়াশুনোয় ভাল। তার ওপরে আরেক বিদ্যে আছে।

সকলেই উৎসুক হলেন—সেটা আবার কী?

মালতী সগর্ব হাসির সঙ্গে বললেন, পদ্য লেখে।

"তাই নাকি!" হো হো করে হেসে উঠলেন বিশ্বনাথবাবু। "তা লিখুক। ও-সব অভ্যেস এই বয়সে অনেক ছেলেরই থাকে। বড় হলে আপনিই কেটে যায়। আমাকেও একদিন ঐ রোগে ধরেছিল।"

"ওমা, তা তো শুনিনি, উচ্চকণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করলেন সরকার-গৃহিণী "তুমি পদ্য লিখতে!"

—তোমার তো বিশ্বাস আমি জন্ম-কেরাণী, চিরকালই এমনি কাট-খোট্টা। তা নয়; এ শর্মার মনেও একদিন কিছুটা রসকস ছিল।

হাসিচ্ছলে বললেও, শেষের দিকে কোথায় যেন একটু ক্ষোভের স্পর্শ লুকিয়ে ছিল।

গৃহিণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ দুটো টান করে টেনে টেনে প্রশ্ন করলেন, তা গেল কোথায়?

তার মধ্যে যে একটি ব্যঙ্গের সুর মেশানো ছিল, সেটা কারো কাছেই অস্পষ্ট রইল না।

উত্তর দিতে গিয়ে একটা গভীর নিশ্বাস ফেললেন বিশ্বনাথ

সরকার। "কোথায় গেল, তা কি ছাই আমিই জানি? ইস্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকতেই বাবা মারা গেলেন। ঘাড়ে চাপল সংসার। তারপর থেকেই চলছে একটানা ঘানির পাক।"

ডান হাতের তর্জনী ঘুরিয়ে সেই 'পাক'-এর একটা ইঙ্গিত দিয়ে হাসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাসিটা ঠিক ফুটল না, কেমন একটা বিকৃত কুঞ্চন দেখা দিল ঠোঁটের কোণে।

মালতী একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। ভাবলেন এবার ওঠা দরকার। তারই উদ্যোগ করতে গিয়ে মহিলাটির দিকে নজর পড়তেই তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল না। সারা মুখে কে যেন একরাশ বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার বিষ মাখিয়ে দিয়েছে। কণ্ঠস্বরেও তার ঝাঁজটা চাপা রইল না—না করলেই হতো সংসার। কেউ তো আর পায়ে ধরে সাধাসাধি করতে যায়নি।

বিশ্বনাথবাবু একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীর বচনস্পর্শে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন। কী একটা বোধহয় বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই মালতী উঠে দাঁড়ালেন। বিনীত কৈফিয়তের সুরে বললেন, এখনকার মতো তাহলে চলি, দিদি। মেয়েটার ফেরবার সময় হ'ল। অবসর মত আপনি একবার যাবেন।

সরকার-জায়া ততক্ষণে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছিলেন। বললেন, যাবো বৈকি? তবে দেখতেই তো পাচ্ছ, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব এই এক হাতে। মরবো যে সে ফুরসৎটুকুও নেই।

অঞ্জলি আগেই কখন উঠে চলে গিয়েছিল।

মালতীকে উঠতে দেখে ওদিকের একটা ঘর থেকে হাসি মুখে বেরিয়ে এলো। তার দিকে নজর পড়তেই গৃহিণী বলে উঠলেন, ঐ, অত বড় মেয়ে। কুটোটি ভেঙে দুখানা করবার নাম নেই।

মেয়ে যেন শুনতে পায়নি, এমনিভাবে মালতীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, আবার আসবেন, মাসিমা।

—আসবো বৈকি? তুমিও যেও। দিদি নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। তোমার তো অনেক সময়। যখন খুশি চলে আসবে।

বিশ্বনাথবাবুও ওঁদের পিছনে পিছনে আসছিলেন। নিচের ফ্ল্যাট থেকে উপরে উঠবার সিঁড়ির মুখে একটা দরজা আছে। মেয়েদের যাতায়াতের সময় খুলে দেওয়া হয়; অন্য সময় বন্ধ থাকে। মালতী যখন সিঁড়িতে পা দিতে যাবেন, তিনি একটু এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললেন, আপনার কোনো অসুবিধা নেই তো?

না, অসুবিধা আর কি?

কোনো কিছুর দরকার হলে বলবেন।

বলবো বৈ কি? আপনাদের আশ্রয়ে এসে উঠলাম। দরকার পড়লেই এটা-সেটা নিয়ে জ্বালাতন করতে হবে।

একশবার করবেন। আমি তো সেই প্রথম দিনই বলে রেখেছি, আমি ল্যাণ্ডলর্ড আর আপনারা আমার টেনান্ট—এটা আমিও মনে করি না, আপনাদেরও ভুলতে হবে। আমরা প্রতিবেশী। নেক্সট্ ডোর না বলে বলতে পারেন নেক্সট্ ফ্লোর নেবার্স।

বলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন বিশ্বনাথবাবু। মালতীও এই সম্পর্কের স্বীকৃতি স্বরূপ একটা সময়োচিত জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মহিলাটির দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলেন, এবং কেবলমাত্র একটি বিনীত নমস্কার জানিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন।

॥ দুই ॥

বাড়ির গা ঘেঁষে চার ফুট চওড়া প্রবেশ পথ। তা দিয়ে কয়েক পা গেলেই দোতলার ফ্ল্যাটে উঠবার দরজা। দেয়ালের গায়ে ইলেকট্রিক বেল-এর সুইচ। টিপতে যাচ্ছিলেন, তার কাগেই কপাট দুটো খুলে গেল। সুহৃদ খুশি ও চমক মেশানো সুরে বলে উঠলেন, তুমি!

মালতী সে কথার জবাব দিলেন না। স্বামীর শ্রান্ত মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বললেন, এত দেরি হল যে?

চল, বলছি। তুমি কোথাও বেরোচ্ছিলে নাকি?

বেরবো আর কোথায়? দেখছিলাম বিশ্বনাথবাবুকে বলে কোনো জায়গা থেকে যদি একটা ফোন করানো যায়। সেই তখন থেকে যাবো-যাবো করছি আর ভাবছি, আর একটু দেখি।

স্বর নামিয়ে মৃদু হেসে যোগ করলেন, ওঁকে আবার কোন কিছু বলতে যাওয়াও মুশকিল।

কেন, বিরক্ত হয় বুঝি বুড়ো? কিন্তু কথাবার্তায় তো তা মনে হয় না।

না, না, উনি মোটেই বিরক্ত হন না, বরং খুশী হন। গিন্নীটি যেন কেমন-কেমন করে।

সুহৃদ এগিয়ে গিয়েছিলেন। পিছন ফিরে সকৌতুক দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে চোখের রূপ বদলে গেল। একটা কোন দূরাগত আলো এসে পড়ল তার উপর। অনেক দিন পরে যেন প্রথম দেখলেন স্ত্রীকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।...বয়স? তা হলো বৈকি? তিনটি সন্তানের মা। বড়টি বাইশ পেরিয়ে তেইশে পা দিয়েছে। তার মানে কয়েক মাস পরেই চল্লিশে পড়বে মালতী। কিন্তু মুখের রেখায়, চোখের

তারায়, দেহের বাঁধুনিতে কোথাও তার ছাপ পড়েনি। আঁট-সাঁট দোহারা গড়ন। একটু হয়তো ভারী হয়েছে আগের চেয়ে ; কিন্তু কোথাও কোনো অনাবশ্যক মেদভার দেহের সাম্য ও সৌষ্ঠব নষ্ট হতে দেয়নি।

কী দেখছ অমন ড্যাব-ড্যাব করে ? তাড়া দিয়ে উঠলেন মালতী। স্বামীর একাগ্র মুগ্ধ চোখ দুটির দিকে চেয়ে তাঁর চোখেও একটি মধুর লজ্জার স্নিগ্ধ ছায়া ফুটে উঠল।

সুহৃদ নিজেকে সামলে নিলেন। হালকা সুরে বললেন, দেখছি, কত্তার খুশি দেখে গিন্নী যদি একটু কেমন-কেমন করেন, তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

কী যে বল তার ঠিক নেই। বাপের বয়সী বুড়ো মানুষ।

আহা, ওঁর কথা কে বলছে ? বেচারা সত্যিই বড় ভালো মানুষ। মনটা ভদ্র। আমাদের একটু উপকার-টুপকার করতে পারলে খুশী হন। কিন্তু জায়গা বিশেষে একজনের খুশি যে আরেক জনের জ্বালা—এসব সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো হয়তো বুঝতে পারেন না। সে যাকগে। ভদ্রলোককে দৌড় না করিয়ে ভালোই করেছ। ফোন্ করে আমাকে পেতেন না।

কেন ?

আফিসে ছিলাম না তো।

কোথায় গিয়েছিলে ? যাক সে সব পরে শুনবো। জামা-কাপড় ছেড়ে আগে কিছু খেয়ে নেবে চলো।

উপরে উঠেই স্বামীর হাত থেকে টুপিটা নিয়ে র‍্যাকে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর রান্না ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, চট্ করে মুখ-হাত ধুয়ে নাও। আমি চায়ের জল চড়িয়ে দিচ্ছি।

সুহৃদ এদিক-ওদিক চেয়ে কারো সাড়া-শব্দ না পেয়ে বললেন, এরা সব কোথায় গেল ?

"কেউ বাড়ি নেই," রান্নাঘর থেকেই জবাব দিলেন মালতী,

খুকু পাড়াতেই এক বন্ধুর বাড়ি গেছে; আর সুমুর কোথায় মিটিং আছে, বলে গেছে ফিরতে একটু দেরি হবে।"

এই শেষের খবরটায় সুহৃদ মনে মনে আবার একটু অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন। পাছে মুখেও তার ছায়া পড়ে, মালতী দেখতে পায়, তাই তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

দুটি ছেলের কে কোন্ দিকে যাবে, সে সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা পরিকল্পনা ছিল। বড়টির বেলায় সেটা সফল হয়েছে। সুবীর এঞ্জিনিয়ার হবে—মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ার, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা পূরণ করেছে। খুব ভালো ভাবে পাশ করেছে শিবপুর থেকে। ব্যবহারিক দিকটায় যাতে আরো দক্ষ এবং অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সুহৃদ কোন বন্ধুর আনুকূল্যে তাকে একটি প্রসিদ্ধ ফার্মে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আপাতত শিক্ষানবিস, একটা অ্যালাউন্স পায়। কোলকাতা থেকে শ-দেড়েক মাইল দূরে বিরাট কারখানা। সেখানে অ্যাপ্রেন্টিস্‌দের জন্যে নির্দিষ্ট মেস-এ থাকে, ছুটির দিনে মা-বাবার কাছে আসে। এদিকে তার মেধা আছে, আগ্রহ আছে এবং খাটতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত। সুহৃদও তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত।

ছোট, সুনীতও এই লাইনে যাক, মেকানিক্যাল না হলেও সিভিল কিংবা ইলেকট্রিক্যাল—গোড়ার দিকে মনে মনে তা-ই চেয়েছিলেন। কিন্তু তার গড়নটা খুব মজবুত নয়, স্বাস্থ্যও একটু দুর্বল। তার চেয়েও বড় কথা, মালতীর ইচ্ছা নয়, দুটি ছেলেই এক দিকে যায়। কারিগরি-শিক্ষাকে সে যে সুনজরে দেখে না, স্পষ্ট ভাবে না বললেও সুহৃদের অজানা ছিল না। তাই ওদিকে জোর না দিয়ে ভেবে রেখেছিলেন, ওকে কমার্স কিংবা অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়াবেন। সুদক্ষ এঞ্জিনিয়রের মত পাকা অ্যাকাউন্টান্টেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে দেশে, ক্রমশ আরো বাড়বে। এ ছেলে বড়টির চেয়ে আরো মেধাবী। ভালো ভাবেই দাঁড়িয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথম দিকে, অর্থাৎ শিক্ষানবিসির স্তরটা পার হয়ে দু'জনেই যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি করতে থাক। তারপর হয়তো আর দরকার হবে না। সুহৃদের মনের তলায় আরেকটা গোপন পরিকল্পনা ছিল। তখনো সেটা দানা বেঁধে ওঠেনি। যখন উঠবে, দুটি ছেলেকেই তাঁর প্রয়োজন হতে পারে।

• মেয়ের সম্বন্ধে ভাববার কিছু ছিল না। সে মেয়ে, এবং সকলের ছোট। বড় হোক, আরো কিছু লেখা-পড়া শিখুক। তারপর সব দিক দেখে-শুনে, স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান, বিনয়ী এবং মোটামুটি ভালো রোজগার করে, এমনি একটি ছেলের হাতে সঁপে দেওয়া। সেদিকে বিশেষ কোন সমস্যা নেই। শিখা রূপেও শিখা। তার উপরে আর যেটা প্রয়োজন, তার ব্যবস্থাও মেয়ের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে করে রাখা হয়েছে। একটি পাঁচ অঙ্কের পলিসি। শিখা আঠারো পেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মেয়াদ শেষ হবে।

এমনি একটা খসড়া ছবি মনের পাতায় এঁকে রেখেছিলেন সুহৃদ রুদ্র। তার উপরে ভিত্তি করে পাকা-নকসা অর্থাৎ ব্লু-প্রিণ্ট্ তুলতে গিয়ে প্রথম অদল-বদলের প্রয়োজন হলো ছোট ছেলের বেলায়। তার জন্যে যে-জায়গাটা চিহ্নিত করে রেখেছিলেন, সেখানে তাকে বসানো গেল না। স্কুলের নিচু ক্লাস থেকেই অঙ্ক দেখলে তার জ্বর আসে। অন্য সব বিষয়ে, বিশেষ করে ইংরেজী বাংলায় নম্বর ওঠে আশি-নব্বই, অঙ্কের খাতায় তিরিশ ওঠাতেই টানাটানি। ঐ দিকে বিশেষ নজর দিলেন সুহৃদবাবু। অঙ্কের জন্যে অভিজ্ঞ টিউটর নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু কাজ যা হলো, সামান্য। কোনরকমে পাশের নম্বর রাখতে হলে যেটুকু দরকার তার বেশী মনোযোগ এই ছাত্রটির কাছ থেকে তার মাস্টার মশাই কিছুতেই আদায় করতে পারলেন না।

সুহৃদ দেখলেন সুনীতের অঙ্কে যেমন প্রচণ্ড বিরাগ, সাহিত্যে তেমনি প্রবল অনুরাগ। তার উপরে শুনলেন, ছেলে নাকি কবিতা

লেখে! অন্য সকলের মত ব্যাপারটাকে মোটেই হালকা ভাবে নিতে পারলেন না। ভালো কেরিয়ারের পক্ষে এটা যে একটা বড় রকমের অন্তরায়, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। এই ব্যাধির হাত থেকে কী করে ছেলেটাকে বাঁচানো যায়, কোন্‌দিকে কতটা কড়া হওয়া দরকার, এই সব কথা যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন এ ব্যাপারে তিনি যতই চিন্তিত এবং শঙ্কিত হোন না কেন, ছেলের মা অত্যন্ত খুশী। এই কাব্যানুশীলনের পিছনে মালতীর রীতিমত প্রশ্রয় আছে। ছেলে তার কবি হবে, সাহিত্যিক হবে—এটা শুধু তার আনন্দ নয়, গর্ব! এরপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ করে যাওয়া ছাড়া সুহৃদ রুদ্র আর কোন পথ দেখতে পেলেন না।

স্ত্রী এবং কনিষ্ঠ পুত্রের উপর খানিকটা অনুকম্পা বোধ করলেন। এমন সব অসার জিনিসের মধ্যে এরা কী পায় কে জানে!

সুনীত ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করল। প্রথম শ্রেণীতে যেতে না পারলেও—তার কারণ বোধহয় সাহিত্য-চর্চা এবং সাহিত্য-বিষয়ক সক্রিয়তা—দ্বিতীয় শ্রেণীর বেশ উপরের দিকেই স্থান পেল। তার মধ্যেই তার সাহিত্য-কর্ম কলেজ-ম্যাগাজিন এবং আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকার সীমানা পার হয়ে দু-একখানা নামী কাগজের সম্পাদকের দাক্ষিণ্য লাভ করেছে। একটি ভক্তগোষ্ঠীও গড়ে উঠেছে তার চারদিকে। সেই সঙ্গে দু'চারটি সাহিত্য-সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছে। এখানে ওখানে নানা উপলক্ষ্যে তাদের ফাংশান বা অনুষ্ঠান লেগেই আছে। সুনীতকে বাদ দিয়ে সেগুলো চলে না।

সুহৃদ এ জগতের খবর রাখেন না। সাহিত্যিক পুত্রের কৃতিত্ব সম্পর্কেও তাঁর উৎসাহ অতি অল্প। মাঝে মাঝে কানে আসে।

মালতী কিংবা শিখার মুখে হঠাৎ কখনো শুনতে পেলেন অমুক কাগজে সুনীতের একটা ছোট গল্প বেরিয়েছে, অমুক সভায় সে

স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাবে, ইত্যাদি। সুহৃদ মুখে বলেন, 'বেশ' কিন্তু মনটা ভিতরে ভিতরে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে—ছেলেটাকে মনের মত করে গড়ে তুলতে পারলেন না। কখনো কখনো তার এবং সেই সঙ্গে মালতীর উপরেও বিরূপ হয়ে ওঠেন। তারপর নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন—সংসারে সব কিছুই যে তাঁর ইচ্ছা বা পছন্দ মত ঘটবে অতটা আশা করা উচিত নয়। তিনি তো চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। তা সত্বেও যদি সে অন্য দিকে চলে যায়, তিনি আর কি করতে পারেন? এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা মানে তাঁর এই ছোট্ট সুখের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করা। ও যা করছে করুক। তবে সাহিত্যের উৎপাতে এম-এ পরীক্ষার ফলটা যেন খারাপ না হয়, সেদিকে ওদের প্রায়ই হুঁসিয়ার করে দিয়ে থাকেন।

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে মাথায় তোয়ালে ঘষতে ঘষতে সেই কথাটা আবার মালতীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, মিটিং-ফিটিং তো খুব হচ্ছে শুনি, আসল ব্যাপারটায় খেয়াল আছে তো? পরীক্ষা তো এসে গেল।

কারিগরি বিদ্যার বাইরে আর কিছুর উপরেই যে তাঁর স্বামীর আস্থা নেই, বিশেষ করে সাহিত্য নামক বস্তুটি যে তাঁর দুচক্ষের বিষ, মালতী সেটা বিলক্ষণ জানেন এবং তার জন্যে কৌতুক অনুভব করেন। তাঁর ঐ 'মিটিং' কথাটার মধ্যে যে ঝাঁজ ছিল সেটা তিনি মনে মনে উপভোগ করলেন। হাসিমুখে বললেন, আছে গো আছে। এবার ও খুব মন দিয়ে পড়ছে। সবাই আশা করছে ফার্ষ্ট ক্লাস পাবে। এখন শরীর গতিক ভালো থাকলে হয়।

কি জানি? আমি তো ওসব দিকে যাকে বলে একেবারে জাহিল। খোকার বেলায় তবু বুঝতে পারতাম কদ্দূর কী করছে। একজন প্রফেসর-ট্রফেসর রাখা দরকার মনে কর?

এখন কোনো দরকার নেই। হলে ও নিজেই বলবে।

হ্যাঁ, যেন সময় মত বলে, তাই দেখো। আমি তো আর কিছু দেখতে-টেখতে পারছি না, এখন তো আরো পারব না।

দুটি জিজ্ঞাসু চোখ স্বামীর পানে তুলে ধরলেন মালতী। হয়তো মুখেও জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, না পারবার বিশেষ কারণ কী ঘটল। তার আগেই সুহৃদ বলে উঠলেন, তোমার চায়ের কদ্দূর?

এই তো হয়ে গ্যাছে। তুমি এসো না?

বাড়িটা দক্ষিণমুখী। সকলের পিছনে রান্নাঘর। তার কোলে বারান্দা। ভাঁড়ার হিসাবে ব্যবহারের জন্যেই তৈরী করেছিলেন বিশ্বনাথবাবু। মালতীদের আগে যে ভাড়াটে ছিল, তারাও একে সেই কাজে লাগিয়েছিল। মালতী ওরই মধ্যে একটা সুন্দর-ঢাকনা-ঢাকা ডিম্বাকার টেবিল আর তার চারদিকে খানচারেক সুদৃশ্য চেয়ার বসিয়ে ওকে একটি আধুনিক ধরনের ডাইনিং রুমের মর্যাদা দিয়েছিলেন। দুপাশের দেয়ালে গোটা কয়েক তাক ছিল। তেল-ঘি এর ছোপ, ঝোলাগুড়ের ছাপ এবং ডাল মসলার ধুলোর তলায় তাদের আসল রংটা যে কি, বোঝা যেত না। রুদ্র গৃহিণী সেগুলোকে ঘষে মেজে, নতুন রংএর পোষাক পরিয়ে জাতে তুলেছিলেন। তার সঙ্গে নানা ধাঁচের মানানসই কাঁচ এবং চীনা মাটির বাসন-কোসন সাজিয়ে গোটা ঘরখানার চেহারা একেবারে পাল্টে ফেলেছিলেন।

ঘষামাজা, সাজানো-গোছানোর পালা যদ্দিন চলছিল, মালতী কাউকে কিছু জানতে দেননি, ঘরটাও বন্ধ করে রাখতেন। সব কিছু শেষ হলে সবাইকে ডেকে হঠাৎ তাক লাগিয়ে দেবেন, এই ছিল তাঁর মতলব। মেয়ে এবং ছেলেদের বেলায় সেটা পারেননি।

সারা দুপুর দরজা বন্ধ করে মা ওখানে কী করেন, সে রহস্য তারা আগেই ভেদ করে ফেলেছিল এবং ব্যাপারটা আবিষ্কার

করবার পর হাতে হাতে মাকে খানিকটা সাহায্যও করেছিল। চমকটা তোলা ছিল সুহৃদের জন্যে। তিনি সত্যিই চমৎকৃত হয়েছিলেন। তখন ঘরে আর কেউ ছিল না। চারদিকে চেয়ে সব জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছেন, এমনি ভাবে বলেছিলেন, যাক্ একটা ভাবনা গেল।

কিসের? বেশ খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন মালতী।

উটকো লোক আর খুঁজতে হবেনা। ঘরের লোককেই পার্টনার করা চলবে।

পার্টনার!

হ্যাঁ; আমি যেদিন নিজের ফার্ম খুলবো, তার। এ রকম ডিজাইনের হাত—

হাত দিয়ে ঘরের চারদিকটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ভারী খুশী হয়েছিলেন মালতী। বুঝেছিলেন, স্বামীর সবটাই খুব ভালো লেগেছে। ভালো-লাগার সরাসরি প্রকাশ তাঁর স্বভাব নয়। বাঃ, চমৎকার—এসব উচ্ছ্বাস-বোধক শব্দ তাঁর অভিধানে নেই। ঐ কথাগুলো তিনি অন্য ভাষায়, অন্য ভাবে বলে থাকেন। সকলে না বুঝলেও মালতী বুঝতে পারেন। সলজ্জ আনত মুখে বলেছিলেন, থাক, যে পার্টনার-গিরি করছি, সেই আমার ভালো। সেটাই যেন বরাবর করে যেতে পারি। তার বেশী আর কিছু চাই না।

শেষের দিকে মুখের সে হাসি-হাসি ভাবটা আর ছিল না। স্বরটাও গভীর হয়ে উঠেছিল।

নিজের হাতে সাজানো গোছানো—তৈরী বললেই হয়—সেই ছোট ঘরটিতে স্বামীকে নিয়ে বসলেন মালতী। সাধারণত এ সময়ে চা বা কফির সঙ্গে হালকা ধরনের কিছুই তাঁকে দিয়ে থাকেন।

ঘরে ছানা কাটিয়ে সন্দেশ করে রাখেন, (সুহৃদের সেটি খুব পছন্দ) তার দু-তিনটে, আর কিছু মুখরোচক নোনতা জিনিস। এর বেশী সুহৃদ বড় একটা খেতে চাননা। বলেন, ভুঁড়ি হচ্ছে দেখছ না? ইনি যদি দিন-দিন, তোমাদের সাহিত্যিকরা যাকে বলেন, 'শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায়' বাড়তে থাকেন, তাহলেই গেছি।

"ভুঁড়ি না আরো কিছু," ঝাঁজিয়ে ওঠেন মালতী, "ঐ করে-করে একটা শক্ত অসুখ না বাধালে বুঝি আর চলছে না? না খেলে দাঁড়াবে কিসের জোরে?"

আজ স্বামীর ফিরতে দেরি দেখে কয়েকখানা ফুলকো লুচি এবং একটি সাদা তরকারী করে রেখেছিলেন। মুখ-ঢাকা পাত্রে উনুনের ধারে বসিয়ে রেখে দিয়েছিলেন, লুচিগুলো যাতে নরম থাকে আর ঠাণ্ডা হয়ে না যায়। একটা ডিসে করে সামনে ধরে দিলেন, অনেকটা ভয়ে ভয়ে। সুহৃদ হয়তো লাফ দিয়ে উঠবেন, এ কী করেছ! এই অবেলায় দিস্তা খানেক লুচি খেয়ে, তারপর?

আজ কিন্তু সে-সব কিছুই বললেন না। বসেই খেতে শুরু করলেন। খিদেও পেয়েছিল। তাছাড়া, চোখ দেখে মনে হলো, এ-সব দিকে তেমন খেয়াল নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কিছু ভাবছিলেন। খেতে খেতে ঘরের চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, সেই দিনটা তোমার মনে আছে মালতী?

কোন দিন? মালতী একটু সচকিত হলেন।

যেদিন তোমার এই ডাইনিং রুমে প্রথম ঢুকলাম।

মালতী জবাব দিলেন না। মুখখানায় যে স্নিগ্ধ হাসিটি দীপ্ত হয়ে উঠল, তার মধ্যেই জবাব পাওয়া গেল।

সুহৃদ বললেন, সেদিন আমার একটা কথা বোধহয় তেমন খেয়াল করনি।

কোন কথাটা বল দিকিন?

বলেছিলাম, যেদিন নিজের ফার্ম খুলবো—

বাঃ, কে বললে খেয়াল করিনি? ওটা কি সেদিন নতুন শুনলাম নাকি?

আরো দু একবার বলেছি, না? আমার অনেক দিনের স্বপ্ন তো?

.. বলে একটু থামলেন। কণ্ঠস্বরে যে আবেশটুকু জড়ানো ছিল, তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সহজ সুরে বললেন, কেন দেরি হল শুনবে? কাশীপুরে গিয়েছিলাম।

কাশীপুর!

হ্যাঁ; একটা চালু কারখানা সুবিধে দরে বিক্রী হচ্ছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, এখন আর ঠিক চালু নেই, প্রায় বন্ধ হবার মত। তবে কয়েক হাজার টাকা হলেই খেটে-পিটে দাঁড় করানো যাবে। কিছু সময় লাগবে। বায়না করে ফেললাম। হাতে টাকা ছিল না। ব্যাঙ্কও তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ওখান থেকে এলাম ভবানীপুরে আমার সেই ডাক্তার বন্ধু বিভূতির কাছে। ভাগ্যিস তাকে পাওয়া গেল। তখনি বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওর কাছে যা ছিল, তাতেও কুলায় না। কোত্থেকে যেন যোগাড়-টোগাড় করে নিয়ে এল। তারপর ছুটলাম মালিকের বাড়ি, মানে শ্যামবাজার। পৌঁছলাম গিয়ে একেবারে যাকে বলে, ইন দি নিক অব টাইম। দুমিনিট দেরি হলে আর হতনা।

এতগুলো কথা প্রায় এক নিঃশ্বাসে শেষ করে সুহৃদ এবার সাগ্রহ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন। প্রায় সারাটা দিন অনেক ছোটাছুটি এবং গভীর উদ্বেগের মধ্য দিয়ে কেটেছে। চোখে মুখে তার চিহ্ন তখনো স্পষ্ট, তার উপরে একটি পরিতৃপ্তিময় সজীব হাসি ভেসে উঠেছিল—দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা যখন প্রথম সাফল্যের আশ্বাস পায়, তখন যে তৃপ্তি জাগে, সেই তৃপ্তি।

মালতী সেটি লক্ষ্য করলেন। স্বামীর এই নতুন উদ্যমে সাড়া

দেওয়া তাঁর কর্তব্য, তাও বুঝলেন, কিন্তু ভিতর থেকে যেন যথেষ্ট জোর খুঁজে পেলেন না। অনেকটা খাপছাড়া ভাবে বললেন, কিসের কারখানা?

বেশিরভাগ মেশিন পার্টস, নানারকম যন্তরপাতি, কল-কারখানায় যা হরদম দরকার হয়। তাছাড়া কিছু বাজার-চলতি এনজিনিয়ারিং গুডস্‌ও হত। ভদ্রলোক পাকা ব্যবসায়ী। প্রচুর পয়সা করেছেন ঐ ফ্যাক্টরী থেকে। এখন আর খাটতে পারেন না। খুব বুড়ো হয়ে পড়েছেন। উপযুক্ত কোনো ছেলে নেই, যে এসব বোঝে বা দেখতে পারে। মাইনে-করা লোকের ওপর ছেড়ে দিলে তিনদিনেই বারোটা বাজিয়ে দেবে, দিয়েছেও খানিকটা, তাই বিক্রী করে দিলেন।

"তুমি খবর পেলে কী করে?" কৌতুহলী হবার চেষ্টা করলেন মালতী।

দু'চারজনকে বলে রেখেছিলাম, তাদেরই একজন খবর দিয়ে গেল। ভদ্রলোক আমাকে আগে থেকে চিনতেন মনে হল। মানে, আমি কি করি-টরি কোথাও হয়তো শুনেছেন। বললেন, আমার সারা জীবনের তৈরী জিনিসটা আপনার হাতে পড়ল দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। বড্ড ভয় ছিল, কে এসে জুটবে, রাখতে পারবে কিনা। আপনি ঠিক পারবেন। তবে নিজে দেখতে হবে, খাটতে হবে। তা না হলে ব্যবসা চলে না।

কিন্তু সেটা হবে কেমন করে? দশটা-পাঁচটা পরের চাকরি করে কারখানার পেছনে খাটবে কখন? দুদিনে শরীর ভেঙে পড়বে—মালতীর স্বরে উদ্বেগ ফুটে উঠল।

কিছুদিন চলুক; তারপর চাকরি ছেড়ে দেবো।

"ছেড়ে দেবে!" রীতিমত চমকে উঠলেন মালতী, "এ রকম একটা চাকরি!" তারপর অনেকটা যেন আপন মনে বললেন, ছেলে দুটোর একটাও এখনো মানুষ হয়ে দাঁড়াল না, মেয়ে বড় হচ্ছে।

সুহৃদ মৃদু হেসে স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন। দেখলেন, তার দুচোখ ভরা গভীর শঙ্কার ছায়া। স্ত্রীকে তিনি ভাল করেই জানেন। বিয়ের আগে তাদের দেখা হয়নি। তবু তার কুমারী জীবনের ছকে-ফেলা দিনগুলোও স্পষ্ট অনুমান করতে পারেন। সবটাই যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। চিন্তার স্রোতটা সেই দিকে ফিরে গেল।

মাঝামাঝি স্তরের সরকারী চাকুরের মেয়ে মালতী। চোখ ফুটবার পর থেকেই দেখে এসেছেন, প্রতি মাসের প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে বাবা একখানি ক্লিপ-আঁটা সাদা খাম মায়ের হাতে এনে দিয়েছেন। তিনি সেটা কপালে ছুঁইয়ে সযত্নে আলমারীতে তুলে রেখেছেন। এ নিয়মের কোন নড়চড় হয়নি। ঐ খামখানার ভিতরে কয়েকখানা গোণাগুণতি নোট। সংখ্যা যাই হোক, তার নিশ্চয়তা অবধারিত। তার উপরে সারাজীবন নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করা চলে।

চাকরি থেকে বেরিয়ে আসার পরেও সে নির্ভরতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। তখনো মাস গেলে একখানি খাম বাবার হাত থেকে মায়ের হাতে গিয়ে পৌঁছবে, শুধু তার ওজনটা অনেক কম। তবু তিনি যতদিন আছেন, সেও ঠিক নিময়মত এবং নির্ধারিত দিনে আসতে থাকবে।

বিয়ের পর এ সংসারে এসেও মালতী তার মায়ের মতো অমনি একখানি খাম স্বামীর হাত থেকে পেয়ে এসেছেন, তাতেই তিনি অভ্যস্ত। এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা ঘটনা সুহৃদের মনে পড়ল।

সওদাগরি অফিসের চাকরে, মাইনে পেতেন চেক্-এ। প্রথম যেদিন বাড়ি ফিরে কোটের পকেট থেকে চেকখানা মালতীর হাতে দিলেন, তিনি উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে বললেন, এ রকম নোট তো দেখিনি। কত টাকার?

সুহৃদ হেসে ফেলেছিলেন।

হাসছ যে।

ওটা নোট নয়, চেক্।

তাই বুঝি? বাবা তো অফিস থেকে টাকা নিয়ে আসেন।

এও টাকা। ব্যাঙ্কে পাঠালেই নোট হয়ে ফিরে আসবে।

অতশত বুঝি না বাপু। আমাকে তুমি সোজাসুজি টাকা এনে দিও। দশ টাকা, পাঁচ টাকার নোট।

পরের মাস থেকে চেকখানা আর বাড়িতে না এনে সরাসরি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিতেন। পরদিন কিংবা কোনো কোনো মাসে সময় করতে না পেরেলে, তিন চার দিন পর টাকাটা এনে পৌঁছে দিতেন স্ত্রীর হাতে।

মালতী একদিন বলে বসলেন, যা-ই বল তোমাদের এই মার্চেন্ট আফিসের চেয়ে সরকারী চাকরি অনেক ভালো।

কেন, বল দিকিন? পেনসন্ আছে বলে? কিন্তু মাইনের বেলায় যে সরকার বাহাত্নরের হাত উঠতে চায় না।

তা হোক, তবু ঠিক পয়লা তারিখে টাকাটা পাওয়া যায়।

এরাও তো তা-ই দেয়।

কই, ফী মাসেই তো দেরি করে দেখি।

সেটা ওরা করে না, করি আমি। চেক্ ভাঙাতে হু-একদিন দেরি হয়ে যায়।

তাই তো বলি। ওখানে এসব চেক্-ফেকের ঝামেলা নেই।

সুহৃদ বলতে যাচ্ছিলেন, ওখানেও চেকের ব্যাপার আছে, উঁচু স্তরের অফিসাররা অনেক ক্ষেত্রে টাকা না নিয়ে চেক্ নেন। বললেন না। মালতী মনে করতে পারেন, তার বাবার চাকরিকে ছোট বলে তাচ্ছিল্য দেখানো হলো।

এমনি আবহাওয়ায় এই মনোভাব নিয়ে মানুষ হয়েছেন মালতী। তার কাছে আয়ের পরিমাণের চেয়ে বড় তার নিশ্চয়তা। চাকরি জিনিসটাকে তিনি বোঝেন, তার থেকে যে প্রাপ্তি সেটা পরিমিত

হলেও নির্দিষ্ট এবং নিয়মিত। তিনি জানেন, এই তার অঙ্ক, এরই সীমার মধ্যে তার প্রয়োজনগুলোকে কেটে ছেঁটে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। ব্যবসা তিনি বোঝেন না, তার অনিশ্চয়তাকে ভয় পান। তার সম্ভাবনা যতই বিপুল হোক, তবু তো সে 'সম্ভাবনা'। হবেই, এবং বরাবর হতে থাকবে—এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

আসল ব্যাপার হলো, উচ্চাশা বা অ্যামবিশন্ বলতে যা বোঝায়, মালতীর মনে তার স্থান অতি পরিমিত। বিপুল ঐশ্বর্যের উপর তার কোন মোহ নেই। স্বামী সন্তান নিয়ে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতার ভিতর দিয়ে তার ছোট্ট সংসারটিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই যথেষ্ট, তার বেশী আর কোন কামনা বা আকাঙ্খা নেই।

মেয়ে যদিও ছোট, তবু, মাঝে মাঝে তার বিয়ে নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সুহৃদের কথা হয়েছে। তার ভিতরেও ঐ একই চিন্তাধারার পরিচয় পেয়েছেন।

জানো খুকুর জন্যে আমার বড় ভাবনা হয়।

সুর অতি গম্ভীর। স্ত্রীকে তো চেনেন। কিছুমাত্র চিন্তিত না হয়ে মনে মনে কৌতুক বোধ করেছেন। বাইরে অবশ্য তার ভাবনার খানিকটা অংশ নেবার ভাব দেখাতে হয়েছে, কেন কী হলো?

মেয়ে এখন থেকেই বড্ড বড়লোক ঘেঁষা হয়ে উঠছে। বাড়ি, গাড়ি দামী দামী শাড়ি, গয়না, পোষাক-আসাক পার্টি-পিক্‌নিক-এসব দিকে ভীষণ ঝোঁক।

কী করবে বল। ওটা হচ্ছে যুগের হাওয়া। চারদিকে যা দেখছে, তাইতো শিখবে। ও জন্যে ভেবো না। বড় হয়ে নিজেদের অবস্থা যখন বুঝবে, তখন আপনিই শুধরে যাবে।

আরেক দিন ঐ প্রসঙ্গ উঠতে সুহৃদ বলেছিলেন, অত ভাবছ কেন? ঐ একটা তো মেয়ে। ওর মন যা চায়, সেই রকম ঘরে যাতে পড়ে, দেখে শুনে তাই না হয় করা যাবে। বাড়ি গাড়ি

আজকাল অনেকেই করছে। সেটা এমন কিছু বিশাল ব্যাপার নয়।

এতটা আশ্বাসের পরেও মেয়ের মাকে বিশেষ চিন্তা-মুক্ত বলে মনে হলো না, খুশী তো নয়ই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, মৃদু অন্তরঙ্গ সুরে, স্বামীর কাছে যেন একান্ত মনের কোন গোপন বাসনা প্রকাশ করছেন, এমনি ভাবে বললেন, কি জানো? আমার একটা মেয়ে, সকলের ছোট, এমন ঘরে গিয়ে পড়বে, যেখানে আমরা ওর নাগাল পাবো না, সেটা আমার ইচ্ছে নয়। আমরা যেরকম, সেই রকম একটি ভদ্র শিক্ষিত পরিবারে যদি যেতে পারে, ও-ও সুখী হবে, আমরাও একঘর এমন কুটুম্ব পাবো, যাকে আত্মীয় করে নেওয়া যায়। বেশী ওপরে উঠতে গেলে, তা হয় না। দেখছ না বড়দির অবস্থা? বাড়ি গাড়ি দেখে মেতে উঠেছিল, এখন দু'বেলা নিঃশ্বাস ফেলে। একটা বাচ্চা হবার পর মেয়েটাকে আর বাপ মায়ের কাছে পাঠায় না। বলে, ছেলের কষ্ট হবে। মেয়েটাও কেমন পর হয়ে গেছে।

এর পরে আর তর্ক চলে না। বলা চলে না, বাড়ি-গাড়ি থাকলেই চোখের পর্দা থাকবে না, এটা যুক্তি নয়; বড়লোক মাত্রেই ছোটলোক নয়। মালতীর এটা সংস্কার। সুতরাং সুহৃদকে সেদিন অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে হয়েছিল।

আজও চাকরি ছাড়বার উল্লেখ করতেই স্ত্রীর চোখে-মুখে যে ভয় এবং দুর্ভাবনার রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখলেন, তার পরেও আর এ নিয়ে কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা বৃথা হবে বলে মনে হলো। সেদিক দিয়ে গেলেন না। মালতীর একটা হাত অলস ভাবে টেবিলের উপর পড়ে ছিল। হাত বাড়িয়ে নিজের বলিষ্ঠ মুঠির মধ্যে টেনে নিলেন। তার উপরে একটি গাঢ় চাপ দিয়ে বললেন, কোন ভয় নেই। তোমার এই সাজানো সংসার যেমন চলছে, ঠিক তেমনি চলবে। কোথাও এতটুকু আঁচ লাগতে দেবো না।

হাতখানা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নিজের ওপর আমার ভরসা আছে, মালতী। আর,"—বলে আর একবার তাকালেন স্ত্রীর মুখের পানে, তারপর হাসি মুখে যোগ করলেন, "তুমি পাশে থাকলে আমি সব করতে পারি।"

এই স্পর্শ, কণ্ঠস্বর এবং সকলের উপরে এই একান্ত নির্ভরতা মালতীর দেহে মনে কোথা থেকে যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে নিয়ে এল। স্বামী চলে যাচ্ছিলেন। সেই দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন, এইমাত্র তিনি যে কটি কথা বলে গেলেন, তাঁর প্রতি পদক্ষেপে তারই ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে। দৃঢ়, স্বচ্ছন্দ গতি। তার মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য নেই, কিন্তু তার প্রতিটি ছন্দ পরিণত বয়সের অবিচল আত্মবিশ্বাসে সজীব।

সেই দিকে চেয়ে নিজের ঝিমিয়ে-পড়া মনটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে টেনে তুললেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সন্দেহগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। এক মুহূর্তে যেন অনেকখানি হালকা হয়ে গেছেন মনে হলো। তার সঙ্গে একটা অপরাধ বোধ—স্বামীর এই প্রগাঢ় বিশ্বাস, এই অটল নির্ভরতা তিনি তো কই আয়ত্ত করতে পারেন নি। সে না পারার মূলে রয়েছে তারই ভীরু, দুর্বল মন। স্বামীর এই বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি, এই বিপুল কর্মৈষণার উপর তিনি আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। তাঁকে ছোট করে দেখেছেন এতদিন। আজ থেকে সব দৌর্বল্য, সব ক্ষুদ্রতা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। ওঁর সঙ্গে সমান কদমে চলতে না পারুন, ওঁকে অনুসরণ করতে তো বাধা নেই। সেখানে যেন কোন ত্রুটি না হয়। সহধর্মিণীর কঠোর দায়িত্ব সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন পালন করে যেতে পারেন।

কয়েক মুহূর্ত আগে স্বামীর মুখ থেকে যা শুনলেন, মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারিত সেই কটি কথা তখনো তার অন্তরের মধ্যে রণিত হচ্ছিল—তুমি পাশে থাকলে আমি সব করতে পারি।

তাই হোক, মনে মনে বললেন মালতী, তুমি যেমন আমাকে অভয় দিলে, আমিও তোমাকে আশ্বাস দিলাম, তোমার এই বিশ্বাসের মর্যাদা আমি ক্ষুণ্ণ হতে দেবো না। সুখে দুঃখে, সকল অবস্থার মধ্যে পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য নিয়ে আজীবন তোমার পাশটিতেই যেন থাকতে পারি, এই আশীর্বাদ ক'রো।

॥ তিন ॥

পর পর দুটো রবিবার প্রবীর বাড়ি আসতে পারেনি। প্রথমটা কেটেছিল দল বেঁধে বাইরে বেরোবার আয়োজনে এবং বেশির ভাগ রেল পথে। সোমবার সকাল থেকে টাটানগর ইস্পাত শিল্পের কতগুলো বিভাগ শিক্ষানবিসদের ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন ওদের কারখানার কর্তৃপক্ষ। তার জন্যে রবিবারেই বেরোতে হয়েছিল।

মাঝে মাঝে বিভিন্ন শিল্প-কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে নানা রকম কলকারখানায় উৎপাদন এবং তার জাতি-প্রকৃতি, হার, সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার সুযোগ দেওয়া ওদের কর্মতালিকায় অন্তর্ভুক্ত। কোনো জিনিস দেখে এবং দেখবার পর যে-প্রশ্ন মনে জাগে, সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর পেয়ে সে সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে, সাতখানা বই পড়েও ঠিক সে জায়গাটিতে পৌঁছনো যায় না—এই সহজ সত্যটা ওঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেটা হয়তো অনেকেই করেন। এবিষয়ে এক কোম্পানীর সঙ্গে আরেক কোম্পানীর তফাৎ ঘটে তার রূপ দেওয়া নিয়ে। সুবীরদের প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার ভার যাঁদের হাতে তাঁরা একে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং তার থেকে কাজও পেয়েছিলেন। অ্যাপ্রেন্টিস-দের অভিজ্ঞতা তাদের নিজ নিজ দক্ষতার ঘরে জমা হলেও তার দ্বারা মালিকপক্ষ কম লাভবান হননি।

তরুণ শিক্ষানবিসদের এই দল-বেঁধে-বেড়ানো ব্যাপারটার নাম দেওয়া হয়েছিল এক্সকারশন—প্রমোদ-ভ্রমণ। তারাও যাতে একে সেইভাবেই দেখে, ডিরেকটর বোর্ড সে দিকে সজাগ ছিলেন, এবং ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের ব্যাপারে কোন ত্রুটি রাখেন নি। আসলে

এটা ওঁদের ইনভেস্ট্‌মেণ্ট। এই বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার রিটার্ণ বা মুনাফা প্রত্যক্ষ না হলেও প্রচুর।

যৌবনের যে উপচে-পড়া এনার্জি বা কর্মশক্তি শুধু ভেসে চলে যায়, তাকে তারা সেই বৃথা অপচয়ের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। আমোদ-প্রমোদের বাঁধ দিয়ে তার স্রোতটাকে ফলনের পথে বইয়ে দেবার আয়োজন করেছিলেন। ফল কম হয়নি, তার উপরে একটা উপরি পাওনাও ছিল—এতগুলো ছেলের গুড উইল।

কাজ জিনিসটা তো শুধু হস্ত-সঞ্চালন বা মস্তিষ্ক-চালনা নয়। দৃশ্যত হয়তো তাই, কিন্তু তার পিছনে একটি অদৃশ্য বস্তু আছে। তার নাম মন। তাকেও ওই সঙ্গে পাওয়া চাই। সেও উৎপাদনের একটা উপাদান, যাকে বলে ফ্যাক্টর অব্ প্রডাকশন। অন্তরালে থাকে বলে অবহেলায় পাত্র নয়।

ওখানকার কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থেই কর্মীদের সেই মনটাকে পাবার দিকেও মনোযোগ দিয়েছিলেন। তার জন্যে ব্যয় কিঞ্চিৎ বেড়েছিল, কিন্তু বাড়তি প্রোডাকশন নিশ্চয়ই সেটা সুদসমেত পুষিয়ে দিয়ে থাকবে। তা না হলে এ স্কিম তাঁরা বন্ধ করে দিতেন।

পরের রবিবারে ছিল পিক্‌নিক্। সেটা অবশ্য কর্মীদের নিজেদের ব্যবস্থা। কারখানা থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি ছোট পাহাড়ের যা ঘেঁষে মনোরম লেক। আসলে, মানুষের হাতের তৈরী জল-ভাণ্ডার, যার নাম ড্যাম। দুরন্ত পাহাড়ী নদীকে বেঁধে তার সংহার-শক্তিকে মানব-কল্যাণের পথে চালিত করবার চেষ্টা করছিলেন বিজ্ঞানীরা। নিতান্তই প্রয়োজনমূলক পরিকল্পনা। এই সঞ্চিত জলরাশি একদিকে লাগবে সেচের কাজে, আরেকদিকে করবে বিদ্যুৎ-উৎপাদন। উদ্দেশ্য—কৃষি শিল্পের উৎকর্ষ, মানুষের আর্থিক উন্নয়ন। অর্থাৎ, অন্নবস্ত্র এবং বাসস্থান বলে তার যে তিনটি মৌলিক প্রয়োজন আছে, তারই পরিপূরণের ব্যবস্থা।

কিন্তু প্রয়োজন কথাটার মধ্যে একটা স্থূলতা আছে, যাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করতে মানুষের রুচিতে বাধে। তাই তার চারদিকে একটি সৌন্দর্যের আবরণ পরিয়ে দেয়। ইউটিলিটির উপর কিঞ্চিৎ বিউটির আচ্ছাদন। বাড়ির দেয়ালে যেমন-তেমন একটা গর্ত খুঁড়ে দিলেই আলো এবং বায়ু চলাচলের প্রয়োজন মিটতে পারে। তবু বহু পরিশ্রমে কারিগরের হাতিয়ারের সঙ্গে শিল্পীর কল্পনা মিশিয়ে সেই গর্তটাকে সে এমন একটি বিশেষ রূপ দেয়, যাতে করে তার প্রয়োজনের চাহিদাও মেটে এবং রুচি-বোধও তৃপ্ত হয়। গর্ত বা ফোকর বললে নিছক প্রয়োজনটাকেই বড় করে কিংবা নগ্নভাবে দেখান হতো বলে তার একটা সুন্দর এবং শ্রুতিমধুর নাম দেয়—জানালা কিংবা বাতায়ন।

হয়তো এই শিল্প-বোধ বা সৌন্দর্য-লিপ্সা থেকেই ঐ জলাধারটিকে লোকে বলত লেক্। অর্থাৎ ওটি যেন মানুষের তৈরী নয়, প্রকৃতির সৃষ্টি। ড্যাম্ নয়, সরোবর।

ড্যামের জন্যে স্থান-নির্বাচনের ব্যাপারে এঞ্জিনিয়ারদের কাছে ঐ পাহাড়টির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ওটা এই সুবৃহৎ চৌবাচ্চার একদিকের দেয়াল। অনেক খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ একে সে চোখে কেউ দেখে না। পর্যটকদের কথা দূরে থাক, এই ড্যাম যাদের সৃষ্টি, সেই এঞ্জিনিয়াররা যখন এই পাহাড়ের পাশ দিয়ে নতুন তৈরী পীচঢালা মসৃণ রাস্তায় জীপ ছুটিয়ে যান, তাঁরাও বোধহয় এর সেই আদিম রূপটা দেখতে পান না। সেটা পড়ে আছে তাদের প্ল্যানের পাতায়, স্মৃতিতেও হয়তো কিছুটা আছে, কিন্তু আজকের মনের পাতায় তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

এই ক'দিন আগেও সব জায়গাটা জুড়ে ছিল এবড়ো-খেবড়ো মাঠ আর তার ধার ঘেঁষে ন্যাড়া পাহাড়। আজ তার কোথাও কটিদেশ কোথাও বা কণ্ঠ বেষ্টন করে এঁকে বেঁকে চলে গেছে

স্বচ্ছতোয়া লেক্। চলে গেছে অনেক দূরে, মানুষের দৃষ্টি যেখানে পৌঁছায় না। কোথাও খাড়া পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা বিশাল পাথরখণ্ড নিচু হয়ে নেমে গেছে, হারিয়ে গেছে গভীর কালো জলের তলায়। এই জলাধার, ঢেউ-খেলানো পাহাড়, তার উপরে ছবির মতো একটি বাংলো এবং দূরের আকাশ—সমস্তটা মিলিয়ে একটি অখণ্ড সৌন্দর্য-লোক, যার সবখানিই মনে হবে প্রকৃতির দান। মানুষের অংশ যেটুকু, তাকে আর আলাদা করে চিনে নেবার উপায় নেই। সে ইচ্ছাও নেই কারো মনে।

ড্যাম যেখান থেকে শুরু, তার উপরে সুদৃশ্য ঘাট। দীর্ঘ সোপান জুড়ে ভিড় লেগেই আছে। ঠিক পাশেই পাহাড়ের পায়ের তলায় অনেকখানি উঁচু-নিচু সবুজ ঘাস-বিছানো জমি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপঝাড়। তার পরে শুরু হল ঘন শাল বন। বনভোজনের জন্যেই যেন সমস্ত পরিবেশটি সাজিয়ে রেখেছেন প্রকৃতি।

দূর দূরান্তর থেকে দলে দলে নরনারী নানা প্রকার এবং নানা আকারের মোটর যানে করে এইখানটিতে ছুটে আসে। কার, বাস্ এবং ট্রাকের ভিড় জমে যায়। গ্রামোফোন আর ট্রানজিস্টার গলার জোরে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। কখনো বা যন্ত্রের সুরকে ডুবিয়ে দিয়ে উদ্দাম হয়ে ওঠে বহু মানুষের বেসুরো কণ্ঠের উল্লাস।

জনতা থেকে দূরে কোন বুনো ঝোপের আড়ালে কিংবা ঘনপত্র শালগাছের ছায়ায় মাঝে মাঝে দু-একটি একক মৃদু কণ্ঠও শোনা যায়। পাশে বসে একটি মাত্র শ্রোতা। যে গাইছে, তার নিভৃত সঙ্গী কিংবা নিরালা সঙ্গিনী।

সুবীররাও দল বেঁধে পিকনিক করতে গিয়েছিল ঐ লেকের ধারে। আগের সপ্তাহে টাটায় যে দল গিয়েছিল, তার থেকে এটি আলাদা। সেখানে ছিল কজন মাত্র শিক্ষানবিস, সঙ্গে দুজন শিক্ষক—অমিশ্র সার্ট কোট ট্রাউজারস্। এখানকার দলটি মিশ্র—বর্ণহীন, শ্রীহীন সার্ট প্যান্টের আশে পাশে দু-চারখানি স্নিগ্ধশ্রী

রঙীন অঞ্চল। বলগাহীন কর্কশ স্বরের মাঝে মাঝে দু একটি সংযত সুরেলা কণ্ঠ।

কোম্পানীর স্থায়ী স্টাফের কেউ কেউ সপরিবারে ওদের দলপুষ্ট করেছিলেন। কিংবা বলা যেতে পারে, পিকনিকের আসল উদ্যোক্তা তারাই। অ্যাপ্রেন্টিস্ ছেলে কটিকে তারা দলভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন উপর মহলের কজন গৃহিণী। তাঁদের স্বামীরা অনেকেই অনুপস্থিত, কিন্তু অনূঢ়া কন্যা, ভগিনী কিংবা ননদেরা বাদ পড়েনি।

দুটো রবিবার বাদ দিয়ে অর্থাৎ পুরো তিন সপ্তাহ পরে সুবীর বাড়ি এসেছে। এরকম বড় একটা হয় না। সকালবেলা পারিবারিক চায়ের আসরটা বেশ জমে উঠেছিল। মামুলি উপকরণের সঙ্গে মালতীর নিজের হাতের দু-একটি বিশেষ টুকিটাকি তাদের স্বাদ ও বৈচিত্র্য দিয়ে উপভোগের মাত্রা এবং কাল দুটোকেই বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের সঙ্গে সুহৃদও যোগ দিয়েছিলেন। প্রতি রবিবারই দিয়ে থাকেন। অন্য দিনগুলোতে সময় হয় না। তিন বেলার আহার পর্ব তাঁকে একাই সেরে নিতে হয়। অবশ্য মালতী উপস্থিত থাকেন, তাও নিছক পরিবেশিকা রূপে। রাত্রি বেলার খাবার টেবিলে ছেলে বা মেয়ে কখনো হঠাৎ জুটে যায়, এই পর্যন্ত। সেই জন্যে রবিবারের প্রাতঃকালীন চায়ের আসরটা তিনি কখনো হারাতে চান না। ছেলেমেয়েরাও ঐ দিনটির জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। বলতে গেলে সপ্তাহান্তে ঐ একটি ঘণ্টা—কখনো তার চেয়ে কম—তারা বাবার কাছটিতে বসতে পায়। তাছাড়া বাবার সঙ্গ অথবা সান্নিধ্য তাদের কাছে দুর্লভ, বিশেষ করে যেদিন থেকে নতুন কারখানাটি কেনা হয়েছে। তারপর থেকে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত। ছুটির দিনগুলোও নানা কাজ দিয়ে ঠাসা।

রবিবার সকাল বেলাকার চায়ের আসরে সুহৃদ রুদ্র অন্য মানুষ।

ডিম্বাকার টেবিলের লম্বা দিকের একটা ধার জুড়ে জাঁকিয়ে বসেন। ওধারের চেয়ারখানায়, অর্থাৎ ওঁর ঠিক মুখোমুখি বসতে হয় মালতীকে। অন্য দিন যেমন স্বামী কিংবা ছেলেমেয়েদের খেতে বসিয়ে দিয়ে রান্নাঘর আর খাবার ঘরে ছুটোছুটি করেন, এদিন সেটা হবার জো নেই। সকলেরই ঘোর আপত্তি।

এই নিয়েই সুহৃদ একদিন বলেছিলেন, রোববারের সকালটাও কি তোমার এই টানাপোড়েন বন্ধ রাখতে পার না?

তাহলে কী করে চলবে? মৃদু হেসে বলেছিলেন মালতী।

উত্তর দিয়েছিল সুবীর—খুব চলবে। আজ আমাদের তাঁত বন্ধ।

এমনভাবে বলছিল, যেন কোনো কাপড়ের কলের মালিক তাঁর কারখানায় লক্-আউট ঘোষণা করছেন। শিখা ও সুনীতের সঙ্গে সুহৃদও উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠেছিলেন, বিশেষ করে ওর ঐ বলার ভঙ্গীতে। ছেলের কাণ্ড দেখে মালতীও না হেসে পারেননি।

তারপর বলেছিলেন, তোমাদের তাঁত তো বন্ধ বুঝলাম, কিন্তু ওদিকে আমার উনুনের তাত চলে গেলে রান্না বন্ধ হয়ে যাবে। তোমরা বসো; আমি একটা কিছু চাপিয়ে দিয়ে আসি।

আর একদফা উচ্চহাসি। মালতী ফিরে আসতে আসতে শুনলেন, সুনীত সশ্রদ্ধ প্রশংসার সুরে বলছে, পান্‌টা (Pun) কিন্তু ভারী চমৎকার হয়েছে। মার কথাবার্তার মধ্যে মাঝে মাঝে এমন একটা সহজ মিষ্টি লিটারারী ফ্লেভার পাওয়া যায়—

"তার চেয়ে অনেক মিষ্টি মার রান্নার ফ্লেভার"—কথাটা শেষ করবার আগেই বলে উঠল প্রবীর, "কাটলেটটা খেয়ে দ্যাখ্।"

বলে নিজেই একটা বেশ বড় টুকরো মুখে পুরে দিল। সুনীত বলল, না ঠাট্টা নয়। আমি সিরিয়াসলি বলছি, মা যদি একটু-আধটু লিখতে চেষ্টা করতেন—

সর্বনাশ! এক বাড়িতে দুজন সেক্‌সপিয়ার—খাওয়া বন্ধ করে রীতিমতো চোখ কপালে তুলল সুবীর।

শিখা তখনো ছোট। তাহলেও এটুকু বুঝতে পারল, বড়দার এই 'দু'জন' কথাটার মধ্যে সুনীতের প্রতি একটা বাঁকা কটাক্ষ রয়েছে। জিনিসটা তার পছন্দ নয়। সাহিত্যিক ছোড়দার উপর স্বাভাবিক ভাবেই তার একটু বিশেষ টান ছিল, সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা গর্ববোধ। অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই বলে উঠল, সেক্সপিয়র বুঝি কেউ চেষ্টা করলেই হতে পারে? আমাদের গ্রামারে আছে, এ নিউটন ক্যানট্ বি এ সেক্সপিয়র বাট এ সেক্স্পিয়র ক্যান্ বি এ নিউটন।

শিখা নিশ্চয়ই ভেবেছিল তার এই প্রতিবাদ এবং বিশেষ করে তার সদ্যপঠিত ব্যাকরণের উদ্ধৃতি সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। তার বদলে গোটা সভাস্থল অট্টহাসিতে মুখর হয়ে উঠল দেখে সে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল। তার মুখের দিকে চেয়ে সুহৃদ সেটা বুঝতে পারলেন। তাঁর একটু উঠবার তাড়া ছিল, কিন্তু উঠলেন না। মেয়ে বসেছিল ঠিক তাঁর ডান পাশটিতে। তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, শোন্ একটা গল্প বলি।

সঙ্গে সঙ্গে শিখার সব ক্ষোভ জল। অন্যেরাও হাসিমুখে উৎকর্ণ।

সুহৃদ শুরু করলেন, তোদের মায়ের ঐ তাঁত, আর তাত থেকে মনে পড়ল। ঐ ছোট্ট চন্দ্রবিন্দুটা নেহাৎ সহজ পাত্তর নয়। আমাদের এক মস্ত বড় প্রফেসারকে একবার রীতিমত ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল।

তোমাদের শিবপুরের প্রফেসর? কৌতূহলী হলো সুনীত।

না; শিবপুরে তখনো ঢুকিনি। এটা তার আগের ব্যাপার, যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়ি। ইংরেজির প্রফেসর।

"তাই বলো"! এ ফোড়নটি প্রবীরের, 'ঘোল-টোল ওঁরাই খেয়ে থাকেন। শিবপুরে ওসব কারবার নেই।" বলে, মুখ না ফিরিয়ে শুধু চোখের কোণ দিয়ে সুনীতের দিকে তাকাল।

সুহৃদ সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ও কথা বলো না। ঐ টাইপের লোক আজকাল আর হয় না। আমি তো অন্তত একটিও দেখিনি। যাক, কী হয়েছিল শোন।

সুনীত এবার দাদার টিপ্পনীর উত্তর দেবার চেষ্টা করল, অবশ্য চোখ দিয়ে। কিন্তু ও-তরফের চোখ দুটো ধরা দিল না। অগত্যা নিরস্ত হয়ে বাবার দিকে ফিরল।

ভারী মজার ব্যাপার। বলে, একটু নড়ে-চড়ে বসে সুহৃদ তাঁর গল্পে ফিরে গেলেন—সাহেব প্রফেসর। বেশ সিনিয়ার লোক। তাঁর বেশির ভাগ ক্লাস ছিল থার্ড-ফোর্থ ইয়ারে। সেকেণ্ড ইয়ার আর্ট্‌স্‌-এ বোধহয় একটা ক্লাস নিতেন। সায়েন্সে কোন লেকচার ছিল না। শুধু সপ্তাহে একটা করে টিউটোরিয়াল। ঘুরে ঘুরে একবার আমাদের ব্যাচটা পড়ল গিয়ে ওঁর হাতে। তার কিছুদিন আগে থেকে উনি বাংলা শিখতে শুরু করেছেন। শিখবার ধরনটা অদ্ভুত, তার মধ্যে দুঃসাহসও কম ছিল না। অক্ষরগুলো কোনো রকমে চিনে নিয়ে প্রাইমার আর ব্যাকরণের পেছনে সময় নষ্ট না করে একেবারে বড় বড় বই ধরে ফেলেছেন। এক একটা সেন্‌টেন্স্‌-এ যতগুলো শব্দ আছে, ডিক্‌শনারী দেখে দেখে তার ইংরেজি মানে বের করেন আর পর পর বসিয়ে যান। তারপর তার থেকে গোটা সেন্‌টেন্সের অর্থটা বুঝবার চেষ্টা করেন। ঐ সময়ে তিনি শরৎ চাটুজ্যের চরিত্রহীন নিয়ে পড়েছিলেন।

অতবড় একটা বই অমনি করে পড়ছিলেন! বিস্ময় প্রকাশ করলেন মালতী।

তবে আর বলছি কেন? ভদ্রলোকের অসাধারণ সাহস। তেমনি ধৈর্যেরও শেষ নেই। চরিত্রহীনের অনেকগুলো চ্যাপ্টার অমনি করে চালিয়ে এসেছেন। শেষটায় একজায়গায় এসে আটকে গেছেন।

টিউটোরিয়ালের খাতা টাতা দেখিয়ে আমরা যখন চলে আসছি, হঠাৎ আমাকে ডেকে ফেরালেন।

তুমি বুঝি সব চেয়ে ভালো ছেলে ছিলে? এ প্রশ্নটি শিখার।

ভালো ছেলে! আরে না, না। তব্যে হ্যাঁ, সব সাবজেক্টে ফার্স্ট্ ডিভিশন নম্বর রাখতে হতো বৈকি! আমাকে কেন ডাকলেন ঠিক জানি না। বোধহয় এমনিই। হয়তো বোরোবার সময় সকলের পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম।

ওসব শুনিসনে, চাপা গালায় মেয়ের দিয়ের দিকে চেয়ে বললেন মালতী। সায়েন্স পড়লে কি হয়, ইংরেজিতেও খুব ভালো ছিলেন। অনেক নম্বর পেয়েছিলেন আই-এস্-সিতে। যার জন্যে তোদের দাদু ওঁকে শিবপুরে দিতে চাননি। বলেছিলেন, বি, এ, পড়।

আই-এস-সি পাশ করে বি, এ!—রীতিমত অবাক হলো সুবীর।

সুহৃদ বললেন, আমাদের সময়ে অনেকে তাই পড়ত। তাতে করে কমপিটিটিভ পরীক্ষাগুলোয় খানিকটা সুবিধে পাওয়া যেত। বাবাও ভীষণ জিদ ধরে বসেছিলেন—আমাকে বি-এ পড়াবার জন্যে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ছেলে একটা আই-সি-এস, টাই-সি-এস হবে। কিংবা অন্তত বি-সি-এস। সে যাক। এবার সাহেবের কাণ্ড শোন।

ব্যাগ থেকে 'চরিত্রহীন' বের করে খুলে ধরলেন আমার সামনে। একটা লাইনের নিচে পেন্সিলের দাগ। বললেন পড়। পড়লাম। সম্ভবত সতীশের কথা—আমাদের গাঁয়ে যেমন ম্যালেরিয়া তেমনি কলেরা। ঠিক ঠিক বলতে পারবো না। আইডিয়াটা ঐ রকম। সাহেব তাঁর খাতা খুলে ইংরেজি তর্জমাটা দেখালেন—ইন আওয়ার বডি দেয়ার ইজ এ্যাজ ম্যাচ্ ম্যালেরিয়া এ্যাজ কলেরা।

তারপর মাথা নেড়ে বললেন, ডাজ নট ক্যারী এনি সেন্স। অথচ ভুলও তো কোথাও দেখছি না। কথার মানেগুলো ঠিক ঠিক বসিয়েছি বলেই মনে হচ্ছে। তুমি একবার ছ্যাখো তো রুড্রা।

আমি এক নজর দেখেই বললাম, সবই ঠিক আছে সাহেব। শুধু ঐ লিটল্ হাফমুন্টাকে তুমি মিস করেছ।

হাফমুন। বইএর ওপর ঝুঁকে পড়লেন সাহেব। আমি 'গা' শব্দটির মাথার ওপর চন্দ্রবিন্দুটিকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, ও-ই সব গোলমাল করে দিয়েছে।

সাহেব তখনো ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না। আমাকে খুলে বলতে হোল—'গা' যদি একা হত, তোমার তর্জমা নির্ভুল। ওর মানে বডি। কিন্তু ঐ পাগড়িটা মাথায় পরবার পর ও আর বডি নয়, ভিলেজ।

"আই সী!" সাহেবের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সারা মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল। হোয়াট ইজ ছাট কল্‌ড ?

বললাম, চন্দ্রবিন্দু।

সাহেব কটমট শব্দটাকে দু তিনবার মনে মনে আওড়বার চেষ্টা করলেন। তারপর বেশ গম্ভীর মুখে বললেন, মাস্ট বি এ ভেরী ডেঞ্জারাস্ হাফমুন।

খাবার টেবিলে হাসির রোল উঠল।

ইদানিং সুহৃদের মুখে এই ধরণের সরস গল্প বড় একটা শোনা যায় না। রবিবারের ব্রেকফাস্টে হাজিরা ঠিকই দেন, গল্পও করেন। তার মধ্যে কিছু কিছু মজার কাহিনীও থাকে, কিন্তু সবই যেন ঘুরে ফিরে তাঁর নতুন কারখানা এবং তাকে ঘিরে যে জগৎ, তার মধ্যে গিয়ে থামে। বোঝা যায়, কাজের ভিতরে যখন থাকেন, তখন তো বটেই, তার ফাঁকগুলোতেও ঐ সব চিন্তাই তাঁর মনের মধ্যে আনাগোনা করে। তার ছাপ মুখের রেখাতেও দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেটা আর কেউ ধরতে পারুক আর না পারুক, মালতীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটিয়ে, হেঁসেলের কাজ-কর্ম সেরে ঘরে আসতে তাঁর দেরি হয়! প্রায় দিনই সুহৃদ তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। দেয়ালে টিউব লাইট জ্বলছে, বালিশের পাশে পড়ে আছে কোনো বই বা জার্নাল—কখনো বন্ধ, কখনো বা আধ-

খোলা। সারাদিন একটানা খাটনির পর সেই প্রগাঢ় ঘুমের মধ্যেও স্বামীর মুখে উদ্বেগের ছায়া লক্ষ্য করেছেন মালতী। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। কিছুদিন আগেও এটা ছিল না। এ নিয়ে সোজাসুজি কিছু বলা যায় না। সুহৃদ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বলিষ্ঠ সরল হাসি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দেবেন। আভাসে ইঙ্গিতে বলবার চেষ্টা করে দেখেছেন, আমল দিতে চান না, এড়িয়ে যান। একদিম বললেন, ওসব তোমার চোখের ভুল। আমি যেমন ছিলাম, ঠিক তেমনি আছি।

কখনো কখনো, যখন হয়তো বুঝেছেন, স্ত্রীর কাছে, বিশেষ করে মালতীর মত স্ত্রীর কাছে, সব কিছু এক কথায় হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিতও নয়, তাতে ওকে আরো ভাবনায় ফেলা হবে, তখন যতটা সম্ভব হাল্কা সুরেই বলেছেন, আগের থেকে এখন একটু তফাৎ হবে বৈকি? চাকরিটা পরের। তার সঙ্গে সম্পর্ক দশটা-পাঁচটা। ওদিনের মত ঐখানেই খতম। তাকে ঘাড়ে করে বাড়িতে বয়ে আনবার দরকার নেই। কিন্তু ফ্যাক্টরিটা যে নিজের। তার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। ওর ওপরে আলাদা টান। ওর জন্যে আলাদা ভাবনা।

এদিক ওদিক চেয়ে কেউ কোথায় আছে কিনা, দেখে নিয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে বলেছেন, এই যেমন তুমি। একান্তভাবে নিজের জিনিস, সারাদিন ছেড়ে থাকতে হয়। তাই বলে কি মন থেকেও দূরে ঠেলে দেওয়া যায়?

"থাক, খুব হয়েছে," ধমকের সুরে, কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার কোন রকম চেষ্টা না করে বলেছেন মালতী, "সারাদিন ধরে আমার কথা যে কতো মনে থাকে, তা আমার বেশ জানা আছে। কোনরকমে একবার বেরোতে পারলেই হলো। আর ফ্যাকটরিতে গিয়ে পৌঁছলে তো কথাই নেই। ও তো ফ্যাকটরি নয়, আমার সতীন।

এর পরেই সুহৃদ রুদ্রের সেই প্রাণ খোলা হাসির ঝড়।

এবারে তিন সপ্তাহ পরে বাড়ি এসেছে সুবীর। সুহৃদের ইচ্ছা ছিল, আরো কিছুক্ষণ বসবেন। কিন্তু হলো না। দু-চারটা কথা বলেই উঠে পড়তে হলো। আরেক কাপ চা চাই কিনা, জানতে চাইলেন মালতী। এই দিনটাতে সাধারণত পরপর দু-কাপই চলে। আজ বললেন, না থাক। তোমরা বসো। আমাকে এখনি উঠতে হবে।

বলে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন এবং মিনিট কয়েকের মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন। মালতীর মুখে একটা চিন্তার ছায়া পড়ল। তখনই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেমেয়েদের গল্প-গুজবে যোগ দেবার চেষ্টা করলেন। ঠিক জমল না। কোথায় যেন তাল কেটে গিয়েছিল। ঠিক আগেকার সুরে আর ফিরে যাওয়া গেল না।

সেই মুহূর্তে শিখার এক বান্ধবী এসে ডাকতেই সে উঠে পড়ল। চায়ের সময় ছেলেমেয়েদের বন্ধুরা কেউ এলে মালতী তাকে ডেকে বসান, চা-খাবার দেন, বাড়ি-ঘরের খোঁজ খবর নেন। আজ কোনটাই করলেন না। একটু পরে সুনীতও তার ঘরে চলে গেল। সুবীরের তখন তৃতীয় পেয়ালা চা চলছে। আড় চোখে একবার ভাই-এর দ্রুত প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, ছোটবাবুর মাথায় বোধহয় ভীষণ কোন গভীর ভাব এসে গ্যাছে। যে রকম হন্তদন্ত হয়ে ছুটল, মনে হচ্ছে এখনি বেঁধে না ফেললে পালিয়ে যাবে।

মালতী চায়ের বাসন কোসনগুলো গুছিয়ে ফেলছিলেন। ছেলের কথায় যোগ দিলেন না। বোধহয় সবটুকু শুনতে পাননি। হঠাৎ খাপছাড়াভাবে প্রশ্ন করলেন, তোর ট্রেনিং শেষ হতে আর কতদিন বাকী?

ছ মাসের কিছু বেশী। কেন?

তারপর ওরাই চাকরি দেবে ?

হ্যাঁ।

কেউ যদি চাকরি করতে না চায় ?

অন্ততঃ দুবছর করতেই হবে। বণ্ড দিতে হয়েছে তো। কেন, সে কথা জিজ্ঞেস করছ যে ?

না, ভাবছিলাম, ট্রেনিংটা শেষ হতেই যদি চলে আসতে পারতিস, ওঁর এই ডবল খাটনির কিছুটা আসান হতো। এ ভাবে চললে শরীর টিকবে কেমন করে ? বয়স হচ্ছে।

"কেন যে সাত-তাড়াতাড়ি একটা ফ্যাক্টরি কিনে ফেললেন ?" সুবীরের সুরে বিরক্তির ভাবটা চাপা রইল না, "আগে জানলেআমি নিষেধ করতাম। আজকাল টাকা করবার আরো অনেক সহজ পথ আছে। তার জন্যে প্রডিউসার হবার কী দরকার ? তার ঝক্কি কি কম ? তৈরী মাল বাজারে কতটা কাটবে, দরে পোষাবে কিনা, এ সব প্রশ্ন তো আছেই, তার চেয়ে বড় ঝঞ্ঝাট হলো লেবার ট্রাবল। কারিগর-কেরাণী সব এক জোট। তাঁদের নিত্যি নতুন আব্দার। বছর বছর মাইনে বাড়াও, বোনাস দাও, বাড়ি দাও, সপ্তাহে দুদিন ছুটি দাও, তা না হলেই 'আমাদের দাবি মানতে হবে' বলে বেরিয়ে পড়ল ঝাণ্ডা নিয়ে। ব্যস, তোমার কারখানাও লাটে উঠল।"

সুবীর যা বলে গেল, কথাটা হয় তো মিথ্যা নয়, কিন্তু তার বলবার ধরনটা কেমন যেন মালতীর ভাল লাগল না। মনে হল, স্বামী যার জন্যে প্রাণপাত করছেন, ছেলে তাকে বড় খেলো করে দেখছে। তাঁর কাছে যেটা অনেক মূল্যবান, এ তাকে সামান্য দাম দিতেও নারাজ। যাই হোক, এ নিয়ে ছেলের সঙ্গে কোন আলোচনা করতে তাঁর ইচ্ছা হলো না। ততটা জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাও তাঁর নেই। শুধু বললেন, কোনো একটা কিছু গড়ে তুলতে হলে তার ঝক্কি, ঝঞ্ঝাট তো আছেই। সেটা এড়াবে কেমন করে ?

সুবীর এবার রীতিমত অসহিষ্ণু হয়ে উঠল—তোমাদের এই সব বড় বড় কথা আমি বুঝতে পারি না। তুমি যাকে গড়ে-তোলা বলে মস্ত বড় গৌরব দিতে চাইছ, আসলে তার উদ্দেশ্য কী? দুটো পয়সা করা। সেটা যদি অন্য রাস্তায় আরো সহজে পাওয়া যায়, কতগুলো রিস্‌ক্ ঘাড়ে নেবো কিসের জন্যে? এই সোজা কথাটা তুমিও স্বীকার করবে, মাল তৈরী করবার দায়িত্ব না নিয়ে, তার পেছনে অজস্র টাকা না ঢেলে, আমি যদি কোনো কারখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাদের তৈরী মালের খদ্দের জোটাবার ভার নিই, তাতে বেশী সুবিধে। এক পয়সা খরচা নেই, মাঝখান থেকে একটা মোটা মুনাফা ঘরে এসে গেল।

ওটাও তো একরকমের ব্যবসা। ওতে টাকা লাগে না?

লাগে; সামান্য। তাও আমাকে নিজের পকেট থেকে দিতে হবে না। সে টাকা যোগাবার লোক আছে। কত চাও?

টাকা তো তোমাকে তারা দান করবে না। বড়জোর ধার দেবে।

কে বললে ধার? তারা দেবে টাকা, আমি দেব আমার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা, আমরা যাকে বলি, নো—হাউ। সোজাসুজি পার্টনারশিপ।

সুনীতের ঘরটা ঠিক পাশে। একটা অসমাপ্ত লেখায় হাত দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই সে ঢুকেছিল। কিন্তু একে তো দাদার গলার পর্দাটা এমনিতেই বেশ চড়া, তার উপরে মাকে তার যুক্তিগুলো বোঝাবার জন্যে সেটা আরো খানিকটা উঁচুতে চড়িয়ে দিয়েছিল। তার ফলে লেখার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সে ঐ কথাগুলোই মন দিয়ে শুনছিল। এবার বেরিয়ে এলো। নেপথ্যে থাকলেও সে যেন শুরু থেকেই এই আলোচনায় যোগ দিয়ে এসেছে, এমনি ভাবে বলল, তার মানে তুমি ব্রোকারদের কথা বলছ, চলতি ভাষায় যাদের বলে দালাল?

"তোমাদের সাহিত্যের ভাষায় কী বলে জানি না।" বেশ খানিকটা ব্যঙ্গের সুরে জবাব দিল সুবীর, "তবে আসলে এরা হচ্ছে, মাল যারা তৈরী করে আর যারা কেনে, তাদের ভেতরকার লিঙ্ক, যাদের কাজ হলো—"

এই দু-তরফ থেকে কিছু লুফে নিয়ে পকেট ভর্তি করা। অর্থাৎ এক ধরণের প্যারাসাইট বা পরগাছা।

যা বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলতে আসিস না। এরা মোটেই প্যারাসাইট নয়, বলতে পার মিডলম্যান, দু-তরফকেই যারা সার্ভিস দেয়। সেটা কারো চেয়ে কম নয়। সব রকম ব্যবসাতেই এদের প্রয়োজন আছে।

হয় তো আছে। তাহলেও যারা ম্যানুফ্যাকচারার, ছোট-বড় নানা রকম শিল্পের ভিতর দিয়ে যারা উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করছেন, দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি যাদের ব্রত, তাঁদের তুলনায় তোমার এই মিডলম্যানরা অনেক ছোট। রোজগারের দিক থেকে ছোট নয়, তা জানি, কিন্তু সমাজে এদের স্থান কোথায়, মর্যাদা কতখানি, সেটা একবার ভেবে দেখো।

তোর ঐ 'সমাজ' কথাটার মানে যদি মান্ধাতার আমলের সমাজ হয়, তাহলে আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু বর্তমান সমাজে এরা কারো চেয়ে ছোট নয়। এখনকার লোকের চোখে কাজটাই বড় কথা, সেটা কী ধরনের কাজ তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, তা নিয়ে এর সঙ্গে তার তুলনা করেও দেখে না।

সুনীত এর উত্তরে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই মালতী শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে, বিশেষ করে সুবীরের উদ্দেশ্যে বললেন, ও-সব তর্ক থাক। কোন কাজটা বড় আর কোনটা ছোট তার চুলচেরা বিচারে আমাদের দরকার নেই। পয়সা কোথায় বেশী, আর কোথায় কম, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েও এখন কোন লাভ হবে না। ভাল হোক, মন্দ হোক, উনি যখন একটা নতুন কাজে

হাত দিয়েছেন, তোমার প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ানো।

একটু থেমে আবার বললেন, সুমুকেও আসতে হবে, ওর যদি কিছু করবার থাকে। তার আগে তোমার আসা দরকার। কেন না, এটা তোমার লাইন, আর বিশেষ করে তোমার ভরসাতেই তোমার বাবা এত বড় ঝক্কি মাথায় নিয়েছেন।

সুবীরের মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া ঘনিয়ে উঠল। যেমন নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনি রইল এবং সেই ভাবেই বলল, বাবা তো আমাকে কিছু বলেননি।

এখনো হয় তো তার সময় হয়নি। যখন হবে, তখন নিশ্চয়ই বলবেন।

এখনি চাকরি ছেড়ে দেবেন, বলছেন নাকি ?

মায়ের দিকে চোখ তুলল। তিনি বললেন এখন কি করে দেবেন ? তোর একটা কোন ব্যবস্থা হলো না, ওদিকে কারখানটাকে দাঁড় করাতেও সময় চাই। তবে ছাড়তে তো একদিন হবেই। তার জন্যে আমাদের সবাইকেই তৈরী থাকতে হবে।

সুবীর আর কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে বেশ চিন্তান্বিত মুখে উঠে চলে গেল।

॥ চার ॥

সোমবার ভোরবেলা ছেলেকে রওনা করে দেবার আগে মালতী জানতে চাইলেন, শনিবার আসছিস তো? সুবীর বলল, কি জানি? যদি কোথাও বেরোতে-টেরেতে না হয়, আসবো।

বেরোনো মানে তো গার্ডেন পার্টি, না হয় পিক্‌নিক্।

শিখা যে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সুবীর খেয়াল করেনি। এই টিপ্পনীটুকু কানে যেতেই পিছন ফিরে তার বিনুনী ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, নিশ্চয়ই। তুই বুঝি মনে করিস ওগুলো তোদের আর তোদের দিদিমণিদের একচেটে অধিকার!

উঃ লাগে না বুঝি? না, সত্যি, এসো দাদা! সবাই মিলে ডায়মণ্ডহারবার যাওয়া যাবে। সেই ক-বে থেকে ভেবে রেখেছি, একবারও যাওয়া হলো না।

আচ্ছা দেখি তো।

শনিবার সকালের ডাকে মালতীর নামে একখানা পোস্টকার্ড এসে হাজির—বিশেষ দরকারে আটকে গেলাম, এ সপ্তাহে আর যাওয়া হলো না।

বিশেষ দরকার বলতে এরা বুঝলেন, পার্টি পিক্‌নিক্ বা ঐ জাতীয় কিছু নিশ্চয়ই নয়, মালিকদের তরফ থেকে এমন কোন আয়োজন, যাতে যোগ দেওয়া অ্যাপ্রেন্টিসদের পক্ষে কাগজে-কলমে ঐচ্ছিক হলেও কার্যত অবশ্যক। আসলে অন্য ব্যাপার। রবিবার আটটায় চীফ এঞ্জিনিয়ার দত্ত সাহেবের বাংলোয় ব্রেকফাস্টের নিমন্ত্রণ। দুদিন আগেই বেয়ারা মারফত বলে পাঠিয়েছেন মিসেস দত্ত। সুবীরের কাছে সেটা অবশ্যই "বিশেষ দরকার"।

আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা পোষাল না। মিনিট পনের বাকী থাকতেই একটু বিশেষ রকমের সাজগোজ করে দত্ত সাহেবের

ড্রইংরুমে পৌঁছে গেল। বেয়ারা সবে তখন আসবাবপত্র ঝাড়া-মোছার পার্ট শেষ করে এনেছে। ওকে বসিয়ে ওদিকের লাইনে বার দুই ঝাড়ন চালিয়ে সেটা কাঁধে ফেলে বলল, আপনি বসুন। আমি মেমসায়েবকে খবর দিয়ে আসি।

সুবীর হাতঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, আরেকটু পরে দিলেই হবে। তাড়াতাড়ি কিছু নেই।

দিদিমণিকে ডেকে দেবো?

চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে করে ফিরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল বেয়ারা।

সুবীর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। মুহূর্তকাল ইতস্তত করে বলল, তিনি কী করছেন?

পড়বার ঘরে আছেন বোধহয়।

তাহলে থাক। তুমি বরং আজকের খবরের কাগজটা দিয়ে যাও।

বেয়ারা চলে গেল। সুবীর ওপাশে পিতলের টপওয়ালা টিপয়ের উপর থেকে একখানা এনিঞ্জিনিয়ারিং জার্ণাল টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। মিনিট-তিনেক পরে এক ঝলক স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধ নাকে যেতেই হঠাৎ চোখ তুলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই দেখুন, চাইলাম কাগজ, আর বেয়ারাবাবু শেষ পর্যন্ত আপনাকে টেনে এনে ছাড়ল।

না, আমি নিজেই এলাম; এইটুকু জানাতে, যে আজকের কাগজের জন্য আপনাকে আরো অন্তত আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

ও, তাইতো। আমারই ভুল। এখানে যে সাড়ে আটটার আগে কাগজ আসে না, হঠাৎ খেয়াল ছিল না।

খেয়াল না থাকাই স্বাভাবিক। আজ এই সময়ে আপনার যেখানে থাকার কথা, সেখানে ছটা বাজার আগেই কাগজ এসে যায়। হয়তো মনে মনে সেখানকার কথাই ভাবছিলেন।

না তো।

ভাবেননি? তাহলে এও হতে পারে যে তারা ভাবছিলেন, আর সেই ভাবনাটা আপনার মনে এসে গেছে, ইংরেজীতে যাকে বলে টেলিপ্যাথি।

না, তাদেরও ভাববার কথা নয়। এ সপ্তাহে যেতে পারব না, আগেই লিখে দিয়েছি।

না যাবার কী কৈফিয়ৎ দিলেন?—সামনের সোফাটায় বসে পড়ে মাথাটা এক দিকে হেলিয়ে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল সুতপা।

কৈফিয়ৎ আবার কী দেব?

দেননি!

একটু যেন শ্লেষের সুর ছিল প্রশ্নটার মধ্যে। সুবীরের তাই মনে হলো এবং বোধহয় তার পৌরুষ কিঞ্চিৎ আহত হয়ে থাকবে। তাই একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলল, বাঃ আমি কি ছেলেমানুষ নাকি?

আর ইউ স্যিওর অ্যাবাউট দ্যাট?

বলেই, যে হাসিটি এতক্ষণ বন্দী হয়েছিল শুধু চোখের তারায় এবং ঠোঁটের কোণে, তার বাঁধন খুলে দিল। ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল তার মধুর ঝঙ্কার।

চীফ এঞ্জিনিয়রের এই খর-রসনা কন্যাটির কাছে এলেই সুবীর কেমন যেন মিইয়ে পড়ে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, কথা বেধে যায়। অথচ দূর থেকে এ যে কি বিপুল বেগে টানে, সেটা জানেন শুধু তার অন্তর্যামী। তবু কেন সহজ হতে পারে না, কী আছে ওর মধ্যে, অনেক সময় ভেবে দেখবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আজও ওটা তার কাছে রহস্যই রয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, ঐ দুটো উজ্জ্বল কালো চোখের সুতীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ওর সম্বন্ধে সুবীরের গোপন মনে যত দুর্বলতা, যত মোহ সবটুকু ধরে ফেলে দিয়েছে। তাই ও উচ্চাসনে বসে রানীর মতো তাকায়, আর সে নিচে দাঁড়িয়ে ধরা-পড়া চোরের মতো জড়সড় হয়ে থাকে।

সুতপার হাসির মধ্যে যে মাধুর্য ছিল, সুবীরকে অভিভূত করে দিল। তেমনি তার প্রচ্ছন্ন একটি সূক্ষ্ম পরিহাসের ধার তার মনের কোণ স্পর্শ না করে পারল না। সে কি শুধু পরিহাস? তাহলে হয়তো বিঁধত না। তার সঙ্গে জড়ানো একটু যেন বিদ্রূপের বাঁকা টান। ওর ঐ চোখের কোণেও তার আভাস আছে। সুতপা বোধ হয় মনে করে সুবীরের মধ্যে পুরুষোচিত দৃঢ়তার অভাব। তার কাজে, কথায় বা আচরণে ব্যক্তিত্বের ছাপ নেই। সে যেন বড় বেশি পরিমাণে বাপ-মায়ের ন্যাওটা ছেলে। তাদের ইচ্ছাকে নিজের জীবনে রূপ দেওয়ার মধ্যেই তার সার্থকতা। তার নিজস্ব কোন পথ নেই, নিজের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করবার, নিজের শক্তিকে ইচ্ছামত নিয়োজিত করবার আকাঙ্খা নেই। নিজের স্বার্থকে আলাদা করে দেখতে শেখেনি। সে যেন শুধু পারিবারিক স্বার্থের তল্পিবাহক।

এসব বা এই জাতীয় কোন কথা সুতপা মুখ ফুটে কখনো বলেনি। সুবীরের সম্বন্ধে এইটাই যে তার ধারণা, তেমন কোন স্পষ্ট ইঙ্গিতও দেয়নি। তার হাসিতে, মুখের ভাবে, চালচলনে, ব্যঙ্গ-মেশানো ঠাট্টা-তামাসায়, বিশেষ করে যখনই কোন সূত্রে সুবীরের বাড়ির প্রসঙ্গ উঠেছে, তখনকার ছোট ছোট মন্তব্যে, যাকে ফোড়ন বলাই ঠিক, এই রকম একটা মনোভাবের আভাস পাওয়া গেছে। হয়তো তার মধ্যে অনেকখানিই তার কল্পনা। কিন্তু একে সত্য বলে ধরে নিয়েই সে সুতপার সামনে নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে প্রকাশ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে এসেছে। মিসেস দত্তের এই ব্রেকফাস্টের নিমন্ত্রণ যেন তারই একটা সুযোগ। এর দ্বারা একটা কথা অন্তত প্রমাণ করা যাবে, যে ছুটি পেলেই সে বাড়ির পানে ছোটেনা, (কথাচ্ছলে একবার কোন পিকনিকে এক ফাঁকে ঐ রকম একটা ছোট্ট টিপ্পনী কেটেছিল সুতপা) ছুটিগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহারের স্বাধীনতা তার আছে।

কিন্তু সব চেয়ে বড় বিপদ, সুতপার সান্নিধ্যে এলেই তার ভিতরকার সেই স্বাধীন মানুষটি যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। এই মুহূর্তে ঐ সামনের সোফা থেকে মধুর কণ্ঠে এবং নিখুঁত ইংরেজিতে উচ্চারিত ঐ ছোট্ট প্রশ্নটি এবং তার পরেই তার মারাত্মক হাসির লহর একেবারে সোজা এসে সুবীরের মেরুদণ্ডের উপর পড়ল। উত্তরে কি যে বলা যায় ভেবে পেল না। হঠাৎ মনে হলো, তাড়াতাড়ি করে নির্দিষ্ট সময়ের খানিকটা আগে এসে পড়াটা তার ঠিক হয়নি। এর মধ্যেও অনেকখানি দুর্বলতা রয়ে গেছে। মনে মনে তারই একটা যুৎসই কৈফিয়ৎ বের করতে গিয়ে হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলে ফেলল, একটু আগেই এসে পড়লাম।

তাই তো দেখছি, নিজের ছোট্ট হাত ঘড়িটার দিকে চোখ রেখে বলল সুতপা, আটটা বাজতে এখনো মিনিট চারেক বাকী। এই সময়টা একটু ঘুরে আসতে চান নাকি ?

কে ঘুরে আসবে ? বলতে বলতে মিসেস দত্ত ঘরে এসে ঢুকলেন এবং সুবীরকে একটা কঠিন অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন। সুতপার প্রস্তাব মতো হয়তো সত্যিই তাকে ঘুরে আসবার জন্যে উঠে পড়তে হতো।

মায়ের কথার উত্তরে সুতপা ছদ্ম গাম্ভীর্যের সুরে বলল, সুবীরবাবু।

কেন, ঘুরে আসতে যাবে কিসের জন্যে ?

বড্ড আগে এসে পড়েছেন কিনা ?

কোথায় আগে এসে পড়েছে ? এলেই বা কী ? তুই বুঝি তাই বলছিলি ?

না না, আমি কেন বলতে যাবো। উনিই ভাবছিলেন। তাই আমি বললাম, চান তো কিছুক্ষণ ঘুরে আসতে পারেন।

ভাখ দিকিনি কাণ্ড, বলে হেসে ফেললেন মিসেস দত্ত। তারপর বললেন, তুমি কিছু মনে করোনা, সুবীর। ওর কথাবার্তাই ঐরকম।

বাজে কথা রেখে ছাখ তো ওদিকে ওরা কী করছে। আর কত দেরী করবে?

যেতে যেতে সুতপা একবার সুবীরের দিকে তাকাল। সেই মুহূর্তে সুবীরও তাকে দেখছিল। চোখে চোখ পড়তেই বুকের ভিতরটা আড়ষ্ট হয়ে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল।

মিসেস দত্ত চোখের কোণ দিয়ে ছজনকেই দেখলেন। তিনি জানেন, তাঁর কন্যাটি রূপসী নয়, কিন্তু সে অভাব পূর্ণ করেছে তার লীলা-চাতুর্য। তার মুখের ঐ অর্ধস্ফুট হাসিটিকে এদিকের এই প্রিয়দর্শন আনত মুখখানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। মনটা মেয়ের উপর খুশী হয়ে উঠল। সত্যিই তার কৃতিত্ব আছে। এতদিন ধরে যে সুযোগ তাকে দিয়ে এসেছেন, সেটা সার্থক হতে চলেছে। সুতপার ঐ হাসি শুধু একটা অর্থহীন হাসি নয়, মেয়েদের মুখে সাধারণত যা লেগে থাকে, ওটা তার বিজয়-চিহ্ন।

তাঁর তরফ থেকে এখনো অনেক কিছু করবার আছে, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। সেই দিকেই নজর দিলেন মিসেস দত্ত। প্রথমেই সুবীরের বাপ-মা ভাই-বোনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিলেন। তার বাবার কাজকর্ম সম্পর্কেও ছ-একটা প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, ওঁর কাছে শুনছিলাম তোমাদের ট্রেনিং শেষ হতে আর দেরি নেই। তারপর তো এরাই তোমাদের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেবে।

হ্যাঁ, অন্তত ছ বছর তো থাকতেই হবে এদের ফার্মে। তার আগে মুক্তি নেই।

সে কথা বলছ কেন? এখানটা কি তোমার ভালো লাগছে না? এত বড় নাম-করা ফার্ম, মাইনে-পত্তরও অন্য অনেক জায়গার চেয়ে ভালো দেয়, ব্যবহার ভালো। তারপর উনি রয়েছেন মাথার ওপর। তোমার যদি কোথাও কোন অসুবিধা থাকে—

না, না ; অসুবিধা কিচ্ছু নেই। চাকরি হিসেবে এখানকার সঙ্গে কোন জায়গার তুলনা চলে না। সব চেয়ে বড় কথা, এ রকম সি, ঈ, কোথায় ? ওঁর কাছে কাজ করা সত্যিই ভাগ্যের কথা। সে-সব দিক থেকে কিছুই বলবার নেই। আমার ব্যাপারটা একটু আলাদা।

ও, তুমি তোমার বাবার ফ্যাক্টরির কথা বলছ? তিনি কি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইছেন ?

না ; এখনো সে-সব বিষয়ে কোন কথা হয়নি। আরো দু-বছর যে এখানে আমাকে থাকতেই হবে তা তিনি জানেন। অবিশ্যি, আমাদের কাছ থেকে যে বণ্ড নেওয়া হয়েছিল, তাতে একটা ক্লজ আছে—অ্যালাউন্সের পুরো টাকাটা দিয়ে দিলে ওদের ছাড়তে আপত্তি নেই।

সেটা কি ঠিক হবে ?

মিসেস্ দত্তের কণ্ঠে রীতিমত দুশ্চিন্তার আভাস পাওয়া গেল। সুবীর আশ্বাস দিল, খুব সম্ভব বাবা তা করতে যাবেন না। তাঁর নিজেরই এখন টাকার দরকার। তবে দু-বছর পরে হয় তো চাইবেন, চাকরি ছেড়ে দিই। নিজেদের ফার্ম, কাজেই আমার তরফ থেকে তখন বলবার কিছু থাকবে না।

মিসেস্ দত্ত সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বললেন না। নিবিষ্টভাবে ভাবতে লাগলেন। তাঁকে বেশ চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে বললেন, তুমি কিছু মনে করো না, সুবীর। কারো পারিবারিক ব্যাপারে বাইরের লোকের নাক-গলানো অন্যায়, তাতে সন্দেহ নেই। এর পরে আমার কিছু না বলাই উচিত ছিল। তবে কি জান ? তোমাকে কবে থেকে দেখছি, আমাদের সকলেরই তোমার ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে। তুমি আসছ যাচ্ছ, বাড়ির ছেলের মত মিশছ, আমরাও তোমাকে ঠিক সেই চোখেই দেখি। তোমার ভাল-মন্দ, তোমার ভবিষ্যৎ একেবারে না ভেবে

পারি না। তুমিও নিজের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা আমাদের কাছে বলেছ, যা শুধু আপন জনকেই বলা চলে। সেই জোরে তোমাকে শুধু একটি কথা বলতে চাই। তোমার বাবা যা বলবেন, অবশ্যই মানতে হবে। তবে তিনি হয় তো আজকাল এই রকম বড় বড় ফার্মে যারা কাজ করছে, সেই সব ইঞ্জিনীয়ারদের চাকরির ধরন-ধারন, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, এ সব ব্যাপারে ততটা অভিজ্ঞ নন। কাজেই কিছু একটা স্থির করবার আগে তুমি ওঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করতে ভুলো না। উনি তো তোমার কাছে শুধু সি-ঈ নন, তার চেয়ে অনেক বেশী।

সুবীর অভিভূত হয়ে শুনছিল। মিসেস্ দত্ত তাকে যে কত স্নেহ করেন, তার শুভাশুভের সঙ্গে কতখানি জড়িত, সবই সে জানে এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করে। এইমাত্র তাঁর মুখ থেকে যে কথাগুলো সে শুনল, তার প্রতিটি শব্দ তার অন্তর স্পর্শ করল। উপদেশ হিসাবেও সেগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। উত্তরে সেও যদি অমন সুন্দর করে, সাজিয়ে তার মনের ভাবগুলোকে বাইরে আনতে পারত! কিন্তু বিধাতা সে দিক দিয়ে তাকে বঞ্চিত করেছেন। গুছিয়ে কথা বলার আর্ট তার জানা নেই। বিশেষ করে এঁদের কাছে সে মুখ খুলতে পারে না। কেবলই মনে হয়, মনে যা ছিল সেটা ঠিকমত বলা হলো না।

এই মুহূর্তে তার সেই নিদারুণ অক্ষমতা সে অতি তীব্রভাবে অনুভব করছিল। অথচ চুপ করে থাকাটা শুধু অশোভন নয়, মিসেস্ দত্ত হয় তো তাকে ভুল বুঝবেন, এ আশঙ্কাও ছিল। তাই নড়ে-চড়ে বসে গলাটা সাফ করে নিয়ে শুরু করল, আপনাদের দয়া, শুধু দয়াই বা বলি কেন, স্নেহ, বিশেষ করে—

এই পর্যন্ত আসতেই, সহসা ঝড়ো হাওয়ার মতো চারদিকে একটা প্রাণময় চাঞ্চল্যের ঢেউ তুলে ঘরে ঢুকল সুতপা। মায়ের

পিছনে দাঁড়িয়ে দু-হাতে তাঁর সোফার পিঠে নাড়া দিয়ে বলল, চল চল, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মিসেস্ দত্ত হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তাই তো, কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। উনি কোথায়?

বাবাকে ডাকতে পাঠিয়েছি। এতক্ষণে বোধহয় নেবে পড়েছেন।

চলো বাবা, সুবীরের উদ্দেশে বললেন গৃহিণী। এগিয়ে যেতে যেতে যোগ করলেন, তপা, ওকে নিয়ে আয়।

সুবীর উঠতেই তার একান্ত কাছটিতে সরে এলো সুতপা। ফিসফিস করে বলল, স-রি, আপনার বক্তৃতায় বাধা দিলাম। কী আর করা যাবে? বাকীটা না হয় ব্রেকফাস্টের পরে সেরে নেবেন। কি বলেন?

উত্তরে যা হোক কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল সুবীর। কিন্তু মনে মনে তোড়জোড় করতে করতেই খাবার টেবিলে পৌঁছে গেল। বলা আর হলো না।

॥ পাঁচ ॥

শিক্ষানবিসি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুবীর যথারীতি ওখানকার চাকরিতেই বহাল হলো। অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার। থাকবার কোয়ার্টার্স'ও পেয়ে গেল কারখানার বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে। দু-রকমের বাড়ি আছে ওদের জন্যে। যারা বিবাহিত, তাদের দুখানা শোবার এবং একটা বসবার কামরা, তার সঙ্গে রান্নাঘর, স্নানের ঘর ও খাবার জায়গা, ওঁদের ভাষায় ডাইনিং স্পেস। সামনে খোলা বারান্দা, তারপরে একফালি জমি—বাগান করবার জন্যে। অবিবাহিত এঞ্জিনিয়ারদের বাড়িগুলো আর একটু ছোট। শোবার ঘর একখানা, বাকী সব একই রকম। শুধু ঘরগুলো বোধহয় মাপে কিছু কম।

নিয়মমত সুবীরের ঐ ছোট ধরণের (কোম্পানীর খাতায় যার নাম বি-টাইপ) বাড়িই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু চীফ এঞ্জিনিয়ার ব্যবস্থা করে ওকে একটা বড় অর্থাৎ 'এ-টাইপ' বাংলো পাইয়ে দিলেন, অবশ্য আর একজন সহকর্মীর সঙ্গে। সেও ব্যাচিলর। একজনের পক্ষে আলদাভাবে রান্না-খাওয়ার বন্দোবস্ত করায় অনেক অসুবিধা, খরচও বেশী পড়ে। তার চেয়ে দুজনে মিলে মেস করে থাকা, (ওদের ভাষায় চামিং) সব দিক দিয়েই ভালো। কোম্পানী কোন আপত্তি করেনি। নতুন এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত। বড় বাড়ির চেয়ে ছোট বাড়ির চাহিদাই বেশি।

প্রথম দিকের অবস্থা তাই থাকে, কিন্তু ক্রমশ উল্টে যায়। চাকরি-বাকরি পাবার পর অবিবাহিতের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে, সেই সঙ্গে 'এ-টাইপ' কোয়ার্টার্সের প্রয়োজন বাড়ে, কখনো কখনো দুর্ঘট হয়ে পড়ে। তখন বিবাহিত হলেও ছোটবাড়িতে গিয়ে উঠতে

হয়। সেই সব সম্ভাবনার কথা ভেবেই মিসেস দত্ত স্বামীকে দিয়ে সুবীরের জন্য একটি বড় বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

স্ত্রীর কাছ থেকে প্রস্তাবটা যখন এলো, এর পিছনে যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, সেটা ঠিক ধরতে পারেননি মিঃ দত্ত। বলেছিলেন, একা মানুষ, অত বড় বাড়ি দিয়ে কী করবে?

আহা, আজ না হয় একা, বরাবর তো একা থাকবে না।

ও, সেই কথা। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে না হবে, তা দিয়ে তো আর বর্তমান ব্যবস্থা বদলে দেওয়া যায় না। কোম্পানী শুনবে কেন?

শুনবে এই জন্যে, যে ওর ভবিষ্যতের সঙ্গে তাদের সি-ঈ-র স্বার্থ জড়িয়ে আছে। সেটা অবিশ্যি উহ্য রাখতে হবে।

এবার বুঝতে পারলেন মিস্টার দত্ত। এই ছেলেটির সম্পর্কে স্ত্রীর মনের ইচ্ছাটা তিনি জানতেন এবং তার পিছনে তাঁর নিজেরও সমর্থন ছিল। সুবীর ও সুতপার হাবভাব চালচলনেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিলেন।

গৃহিণীর দূরদৃষ্টি দেখে চমৎকৃত হলেন। বললেন, তাই তো, এসব আমার একেবারেই মাথায় আসেনি। ঠিক বলেছ। এর পরে বাড়ি পাওয়া মুশকিল হতে পারে।

মিসেস মনে মনে পুলকিত। বাইরে বিস্ময় প্রকাশ করলেন—

এই মাথা নিয়ে কী করে যে এতবড় একটা ফ্যাক্টরী চালাও, আমি তো ভেবে পাইনা, বাপু।

কেন, মাথাটা তো একা নয়, তার পাশে এটি আছে কী করতে? বলে, ব্ল্যাকউড অ্যাণ্ড সনস্ কোম্পানীর অতবড় রাশভারী প্রবীন চীফ এঞ্জিনিয়র বীরেশ্বর দত্ত পার্শ্ববর্তিনীর একান্ত কাছটিতে এগিয়ে গিয়ে তাঁর শুধু মাথা নয়, সেই সঙ্গে চিবুকটা ধরে নেড়ে দিলেন।

একজনের জন্যে একটা 'এ-টাইপ' বাড়ি সুপারিশ করা নেহাৎ দৃষ্টিকটু এবং সি-ঈ-র মতো ব্যক্তির পক্ষে শোভন নয়। তার

উপরে যাকে সেখানে বসানো হচ্ছে ওঁদের কাছে সে যে-কোনো একজন নয়, বিশেষজন, একথা যখন জানাজানি হয়ে যাবে, তখন কর্মীদের মধ্যে শুধু কানাকানি শুরু হবে না, কোম্পানীর কাছেও তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তাই সুবীরের সঙ্গে আর একটি ছেলেকে জুড়ে দেবার পরামর্শ মিসেস দত্তই দিয়েছিলেন। এখানেও তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া গেল। এই কৌশলটুকু প্রয়োগ না করলে কোম্পানীকে রাজী করানো হয়তো কঠিন হতো।

গোড়াতে সুবীরের কাছে কথাটা পাড়তে গিয়ে মিসেস দত্ত তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কোন আভাস দেননি। শুধু বলেছিলে, এতদিন কাটিয়েছ হস্টেলে। বাজার থেকে কী আসবে, কী রান্না হবে, এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি। এখন একা বাড়িতে একটা চাকর নিয়ে কী করে যে চালাবে, তাই ভাবছি।

ও ঠিক চালিয়ে নেবো। আর সবাই যদি পারে আমাকেও পারতে হবে।

সবাইয়ের কথা ছেড়ে দাও। ওদের তো আমি জানি। অতি সাধারণ পরিবারের ছেলে। অনেকেই কষ্টে মানুষ হয়েছে। ওরা ছেলেবেলা থেকেই সংসারী। তুমি তো বাবা ওদের দলে পড় না।

এই কটি কথায়, বিশেষ করে শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠে যে গভীর দরদ ফুটে উঠল, আড় চোখে তাকিয়ে শ্রোতার উপরে তার ফলাফলটা একবার দেখে নিলেন। দেখলেন সবটাই সফল। সুবীরের সমস্ত মুখখানা বেশ একটু গর্ব-মেশানো খুশিতে উজ্জ্বল।

যারা আমার সমকক্ষ এবং সমশ্রেণী তাদের থেকে আমি স্বতন্ত্র, আমার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, একথা শুনলে কে না খুশী হয়? বিশেষ করে, সেটা যদি এমন একজনের মুখ থেকে শোনা যায়, যাকে আমি শ্রদ্ধা করি, যার মতামতের মূল্য আমার কাছে অসামান্য।

মিসেস দত্ত যেন হঠাৎ একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছেন, এমনি-

ভাবে বললেন, আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন? তোমার সঙ্গে মিশ খায়, বেশ ভাব আছে এমন একটি বন্ধু জুটিয়ে নিয়ে তুজনে মিলে একটা 'এ-টাইপ' বাড়ি নাও না কেন?

তাহলে তো খুব ভাল হয়। কিন্তু 'এ-টাইপ' আমাদের দেবে কি?

দেবে কি না, সে ভাবনা তোমার নয়। সেটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমাকে খালি ভাবতে হবে এ রকম একটি বন্ধু তোমার আছে কিনা।

তা আছে বৈ কি? ঐ তো নিলয় রয়েছে। আমার জন্যে ও সব করতে পারে। এদিকে বেশ চৌকস ছেলে। যাকে বলে পাকাপোক্ত।

মিসেস দত্ত যখন ছেলেটিকে মনে করবার চেষ্টা করছেন, সুবীর তাঁকে সাহায্য করল, 'ওকে আপনি দেখছেন। রোগা লম্বা; ভাল ভায়োলিন বাজাতে পারে। আমাদের ক্লাবে ফ্যাংশান-টাংশানে কয়েকবার বাজিয়েছে।

ও-ও, সেই ছেলেটি? ওকে তো আমি চিনি। আমার এখানে এসেছে তু-একবার। ও তোমার খুব বন্ধু বুঝি?

খু-উ-ব। নিলয় যা ক'রে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, শুনলে আশ্চর্য হবেন। বাবা ভাল চাকরি করতেন, হঠাৎ মারা গেলেন। তখন ও খুব ছোট, স্কুলে পড়ে। টাকাকড়ি যা ছিল, কাকারা সব ফাঁকি-টাকি দিয়ে নিয়ে নিল। রইল খালি ছোট্ট একখানা একতলা বাড়ি। তারই খানিকটা ভাড়া দিয়ে, সন্ধ্যাবেলা ছেলে পড়িয়ে, নানা কাণ্ড করে ওকে পড়াশুনা করতে হয়েছে। রেজাল্ট আগাগোড়া ভাল। গেল বছর ওর মা-ও মারা গেছেন। এখন একেবারে একা।

থাক সুবীর ও-সব কথা শুনলে আমার কষ্ট হয়। আমাদের দেশে এ-রকম পরিবার যে কত আছে!

মিসেস্ দত্তের এই উক্তিটিও বড় করুণ শোনাল, এবং সুবীরের মনকে স্পর্শ করল। কিন্তু বক্তার মনের ভিতরটা যদি সে

দেখতে পেত, তাহলে দেখত যে, সেখানে বেশ নির্ভাবনার ভাব জেগে উঠেছে। নিলয়ের কাহিনী থেকে তাঁর যেটুকু পাবার তিনি পেয়ে গেছেন। এটুকু বুঝে নিয়েছেন, যে ভবিষ্যতে, ঈশ্বর-ইচ্ছায় অদূর ভবিষ্যতে, ঐ বাড়িখানা যখন সুবীরের পুরোপুরি দখল করবার প্রয়োজন হবে, এই পার্টনারটিকে অনায়াসে সরিয়ে দেওয়া যাবে। সকলের বেলায় হয় তো সেটা সহজসাধ্য হত না। কিন্তু এই ছেলেটার সঙ্গে সুবীরের যে সম্পর্ক, ও নিজে থেকেই সরে যাবে।

কথা হচ্ছিল সকালবেলা, মিসেস্ দত্তের সুসজ্জিত ড্রইংরুমে। সুবীরকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এবার ওর ওঠা দরকার। কাজে বেরোবার সময় হলো। উঠতে গিয়েও মনে হচ্ছিল, একবার কোনো সুযোগে যদি আরেকজনের সঙ্গেও দেখাটা হয়ে যেত! মিসেস্ দত্ত অন্তর্যামী নন। তবু বোধহয় তাঁর তরুণ অতিথির অন্তরের কথাটা জানতে পারলেন। বললেন, সুবীর, তুমি বসো। আমার একটু কাজ আছে।

সুবীর তার হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, আমিও এখন চলি।

দু-মিনিট বসো। একটু কফি খেয়ে যাও। ওর এক বন্ধু বাঙ্গালোর থেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর নিজের বাগানের কফি।

কফি এলো এবং তার পিছনেই সেই প্রার্থিত জন। সুবীরের কাছে শুধু 'জন' নয়, আরো অনেক কিছু, যাকে কথার ছাঁচে ফেললে নেহাৎ জোলো কবিত্বের মতো শোনায়, (এই যেমন—এক ঝলক আলো, কিংবা একরাশ চঞ্চল হাওয়া) অথচ মনের ভিতরে যে রূপটি রয়েছে তার সামান্য আভাসও দেওয়া যায় না। আরো মুস্কিল, সুবীরের ভাষা এ-সব ব্যাপারে শুধু আড়ষ্ট নয়, পঙ্গু।

ও-তরফের ভাবে বা ভাষায় কোন রকম গভীরতার লক্ষণ প্রকাশ পেল না। সুবীর যে কৌচটায় বসেছিল, তার পাশের সোফায় ধপ করে বসে পড়ে স্প্রিংএর দোলায় দুলে উঠে সুতপা। প্রথমে একটা

মস্ত বড় হাঁফ ছাড়ল, তারপর বলল, যাক একটা কঠিন সমস্যা মিটে গেল।

কিসের সমস্যা! সুবীরের চোখে-মুখে প্রচুর বিস্ময়।

সত্যি ; চাকরি পেয়ে কী আতান্তরেই না পড়েছিলেন!

সুবীর তখনো কিছুই বুঝতে পারছে না, তেমনি অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

সুতপা, যেমন তার নিয়ম, ঘাড়টা একপাশে একটু নুইয়ে তার দিকে তাকাল। সেই সঙ্গে একটি মধুর হাসি উপহার দিয়ে বলল, এবার খুব খুশী তো? কেমন একজন মনের মতো চৌকস গার্জেন পেয়ে গেলেন। তা না হলে কী যে হত আপনার, তাই ভাবছি।

'চৌকস' শব্দটা এমন জোর দিয়ে উচ্চারণ করল, বোঝা গেল ওটা উদ্ধৃতি।

সুবীর আকাশ থেকে পড়ল—গার্জেন! সে আবার কে?

ঐ যে, আপনার ভীষণ বন্ধু, কি নাম যেন, বিলয়, না প্রলয়!

ও-ও, নিলয়?...বলে, হেসে উঠল সুবীর।

সুতপার হাসি ও দুষ্টুমি-ভরা চোখ দুটি তখনো তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। সুবীরের মনে হলো, এত সুন্দর এবং এমন দুর্দান্ত সুন্দর ওকে আর কখনো দেখায়নি। সেই মুহূর্তে, কেমন করে কে জানে, তার জিহ্বার সেই জড়তা হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। বেশ সহজ সুরে বলে উঠল, গার্জেন হলেও, ও তো টেম্পোরারী। পার্মানেণ্ট গার্জেনটি যদ্দিন না আসছেন, তদ্দিন ভাবনা কাটছে কই?

"পার্মানেণ্টে গার্জেন মানে?" একটু বোধহয় সচকিত হলো সুতপা।

সুবীর এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সব কথার কি আর মানে থাকে, সুতপা,—না, থাকলেই তা বলা যায়?...যাক্, এবার আমি উঠি।

এক লাফে উঠে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে আর ফিরে তাকাল না। তাকালে দেখতে পেত, যার উদ্দেশ্যে বলা, তার মুখের সেই প্রগলভ হাসিটি আর নেই, চোখের সে চঞ্চল দৃষ্টিও হঠাৎ চলে গেছে। তার বদলে দেখা দিয়েছে ভীরু, কোমল, রক্তিমাভায় জড়ানো একটি প্রশান্ত গাম্ভীর্য।

এমন স্পষ্ট, সহজ, সাবলীল অথচ গভীর উক্তি সুবীরের মুখে আজ সে প্রথম শুনল। কোথা থেকে যেন একরাশ অকারণ আনন্দ এবং তার সঙ্গে একটি মধুর লজ্জার আবেশ এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

সুবীর ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিল, এই কথাগুলো সে এমন করে বলতে পারল কেমন করে। সে হয়তো তখনো জানে না, সব মানুষের অন্তস্থলেই একটি নিভৃত গোপন মণিকোঠা আছে। তার মধ্যে অতর্কিতে একদিন কোথা থেকে একটি বিশেষ পরশমণির আবির্ভাব ঘটে। সেই আশ্চর্য লগ্ন যখন আসে, তখন সে সব পারে। সেই পরশমণি তার জাদুস্পর্শ দিয়ে অসাধ্য সাধন করায়। অন্ধকে যেমন চক্ষুষ্মান করে, তেমনি মূকং করোতি বাচালং, মুখ ফুটে যে মনের কথা কোনোদিন বলতে পারেনি, তাকেও সহসা বাঙ্ময় করে তোলে।

॥ ছয় ॥

সুবীরের চাকরি হবার খবর পেয়ে মালতী প্রথমেই ভাবলেন, একটা ভাল দিন দেখে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে হবে। তারপরেই যে কথাটি মনে এল, সেটা তাঁর পুরনো ভাবনা, এতদিন ধরে যা ভেবে এসেছেন, যার অপেক্ষায় একটি একটি করে দিন গুণছেন—আরেক জনকে এবার চাকরি ছাড়তে হবে। আর দেরি নয়। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এতদিন তিনি জোর পাননি। বলতে গিয়েও থেমে গেছেন। সুহৃদ যে উত্তর দেবেন তা তো তাঁর অজানা নয়। মুখে সেই হাসিটি ঠিকই থাকবে, কিন্তু কণ্ঠে যে একটি নিরুপায়ের সুর বেজে উঠবে, শত চেষ্টাতেও তাঁর কাছে সেটা চাপা থাকবে না। বলবেন, ছাড়বো তো বুঝলাম। তারপর? একটুখানি থেমে হয় তো যোগ করবেন, চলবে কেমন করে? মালতীর আর কোন জবাব নেই। তিনি জানেন কারখানাটা এখনো পুরোপুরি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। যা দিচ্ছে তার থেকে অনেকখানি আবার তার পিছনেই ঢালতে হচ্ছে।

ব্যাপারটা সেদিন চমৎকার করে বুঝিয়েছিলেন সুহৃদ—গরু বাচ্চা দেবার পর প্রথম কিছুদিন গয়লারা কি করে জান তো?

মালতী বলেছিলেন, জানি, দুধটা ঐ গরুকে খাইয়ে দেয়।

আমাকেও এখন তাই করতে হচ্ছে। বাঁট থেকে যা পাচ্ছি, তখনি নিয়ে মুখের কাছে ধরছি।

এর পরে, কেমন করে চলবে, সে প্রশ্নের আর কী জবাব থাকতে পারে? কিন্তু এবার আর জবাবের জন্যে ভাবতে হবে না। সুবীর যা-ই তাঁর হাতে তুলে দিক, তাই দিয়েই তিনি চালিয়ে নিতে

পারবেন। দরকার হলে ছুটি ঝি-এর একটিকে ছাড়িয়ে দেবেন। একজন শুধু বাসন ক'খানা মেজে, রান্না আর খাবার ঘরটা ধুয়ে দিয়ে যাবে। বাকী সব কাজ নিজেদের। পরনের ক'খানা কাপড় কেচে মেলে দেওয়া, তোলাপাড়া, ঘরদোর ঝাড়া-পোছা তিনি আর মেয়ে মিলে হাতে হাতে করে নেবেন। মেয়ে সেদিক দিয়ে বড় ভাল। গোড়াতে যে-আশঙ্কা ছিল, স্বামীর কাছে একদিন যেটা প্রকাশও করেছিলেন,—বড় বেশী বড়লোক ঘেঁষা হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিখা—একটু বড় হতেই দেখা গেছে সেটা অমূলক। উনি ঠিকই বলেছিলেন, ওটা কিছু নয়, নিজেদের অবস্থা যে-দিন বুঝতে শিখবে, সেদিন দেখো ওসব আর থাকবে না। তা-ই দেখছেন এখন। দাদাদের মতো পড়াশুনায় ভাল, তবু সংসারের কাজেও সমান দৃষ্টি। যখনই সময় পায়, মায়ের সঙ্গে ঘুরছে। চালচলনেও কোন চাল নেই। ওকে দিয়ে তিনি সব কিছু সামলে নিতে পারবেন।

তাঁর ভাবনা শুধু সুবীরকে নিয়ে। আব কিছু নয়। ছেলেব বড খরচে হাত। টাকাগুলোকে যেন যেমন-তেমন করে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে। হিসাব-পত্তরের বালাই নেই। ওখানে এতদিন যে অ্যালাউন্স পেত, একজন মানুষেব সচ্ছলভাবে চলবার পক্ষে শুধু যথেষ্ট নয়, তার চেয়ে বেশী। ওর কাছেই শুনেছেন, ঐ টাকা থেকে ওঁদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে কিছুটা করে বাড়ি পাঠায়। নিলয় বলে ওর কে এক বন্ধু আছে, তার কথা প্রায়ই বলে। যদ্দিন মা ছিলেন, তাঁকে নিয়মিত টাকা দিতে হত। এখন জমায়। ব্যাঙ্কে একটা এস. বি অ্যাকাউন্ট্ খুলে নিয়েছে, মাসের গোড়াতেই বেশ খানিকটা করে পাঠিয়ে দেয়। আত্মীয়-স্বজনদেরও কিছু কিছু করে দেয়।

তুইও তো দু-চারটাকা করে রাখলে পারিস—ঐ সূত্রেই একদিন বলেছিলেন মালতী।

আমি ? সর্বনাশ ! এমনিতেই কুলোতে পারি না, তার ওপরে আবার জমানো ?

বলে, এমন ভাবে লাফিয়ে উঠেছিল, যেন মা তাকে ভয়ঙ্কর একটা কিছু করতে বলেছেন।

সত্যিই কুলোতে পারত না। মাঝে মাঝে কতবার এসে হাত পেতেছে মায়ের কাছে। আর একটা সার্ট করাতে হবে, কলমটা কোথায় ফেলেছে, খুঁজে পাচ্ছে না, একটা পার্কার চাই, বন্ধুরা একদিন খাইয়েছিল, একটা রিটার্ণ ভোজ না দিলে মান থাকে না—এমনি ধারা একটা না একটা প্রয়োজন লেগেই ছিল বরাবর।

আজ সেই কথাই ভাবছিলেন। সে যে কতটা কি দিতে পারবে, সে সম্বন্ধে ঠিক নিশ্চিত হতে পারছিলেন না।

চাকরি পাবার পর প্রথম যেবার বাড়ি এলো, সুযোগ করে ছেলেকে আলাদা ডেকে নিয়ে প্রথমেই ঐ কথা পাড়লেন মালতী। মাইনের অঙ্কটা, কোয়ার্টার্সের দরুণ কত কাটবে, প্রভিডেন্টফাণ্ডে কত ফেলতে হবে, সব জেনে নিয়ে বললেন, ওঁর অবস্থা তো দেখছিস। চাকরি আর রাখা চলে না।

সুবীর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। মালতীর সাগ্রহ দৃষ্টি ছিল ছেলের মুখের উপর। সে মায়ের দিকে তাকাল না। জানালার বাইরে চোখ রেখে বলল, ফ্যাক্ট্রী থেকেও তো বিশেষ কিছু আসছে না, শুনলাম।

মালতী এ ধরণের উত্তর আশা করেননি। ভেবেছিলেন, ছেলেও তাঁরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলবে, 'বেশ তো, ছেড়ে দিতে বল না? এখন আর এই ডবল খাটনির দরকার কী?' কিন্তু সে মোটেই সে দিক দিয়ে গেল না। মালতী শুধু নিরাশ হলেন না, মনে মনে কিছুটা বিরক্ত হলেন। পরের কথায় তার আভাস পাওয়া গেল—তুই কি ভাবছিস আমি ফ্যাক্টরীর ওপর ভরসা করে চাকরি ছাড়বার কথা তুলেছি ?

জানি। কিন্তু আমাকেও তো একটু গুছিয়ে-টুছিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া, এখানে-ওখানে আমার কিছু দেনাও আছে।

দেনা! সবিস্ময়ে শুধু ঐ একটি শব্দই বেরোল ওঁর মুখ থেকে।

ভয় পাবার মতো কিছু নয়। তবু শোধ তো দিতে হবে। তাতে সময় লাগবে।

একটুখানি থেমে আবার বলল, তাছাড়া, ওখানে আলাদা বাড়ি নিয়ে থাকার খরচও অনেক।

মালতী ঐখানেই থেমে গেলেন। এসব কথা আর কেউ জানল না, স্বামীকেও জানতে দিলেন না। রাত্রে বিছানায় গিয়ে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। ছেলের মুখের প্রতিটি রেখা, তার কণ্ঠ, তার সেই অপ্রত্যাশিত উক্তি এবং যা অমুক্ত থাকলেও অস্পষ্ট ছিল না,—তার হাবভাব থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল—সব মিলিয়ে একটা হতাশাময় ছবি তাঁর দু-চোখের উপর ভেসে উঠতে লাগল। একটা দুরন্ত অভিমানে বুক ভরে উঠল—এই তাঁর ছেলে! তাঁর প্রথম সন্তান! কত আশা ভরসা নিয়ে ওকে তাঁরা মানুষ করেছেন। সামান্য মাইনে তখন সুহৃদের। তার বেশির ভাগই গেছে ওর পিছনে। তিল পরিমাণ অভাব কখনো টের পেতে দেননি। যখন স্কুল-কলেজে পড়ত তখন থেকেই ও উড়নচড়ে। ওর বহু অপব্যয়ের বোঝা ওঁরা নিঃশব্দে বহন করে এসেছেন। তিনি যদি বা দু-এক কথা বলতে গেছেন, স্বামী বাধা দিয়েছেন—থাক, ওসব ছোটখাটো ব্যাপারে খিটমিট করলে ছেলেমেয়েদের মন খিচড়ে যায়। একেবারে ছেলেমানুষ। বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি! বড় হলে সব সেরে যাবে।

এই তো সারল!

পাশের খাটে সুহৃদ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে ফিরে শুয়ে আছেন। ঘরের বাইরে বারান্দার আলোটা জ্বালা রয়েছে, জ্বেলেই রাখেন সারারাত। জানালা দিয়ে তার খানিকটা

ঘরেও এসে পড়েছে। সেই অস্পষ্ট আলোতেও বেশ বোঝা যায়, দিন দিন আরো শীর্ণ হয়ে পড়েছেন সুহৃদ। কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠেছে, চোখের কোলে বলি রেখাটা কত গভীর! এই তিন চার বছরে যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে মানুষটার। এইভাবে চললে শুধু সর্বনাশকেই ডেকে আনা হবে। ভাবতে গিয়ে মালতীর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ স্বামীর দিকে চেয়ে থেকে মনটা ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠল। কিসের অভিমান, কার উপরে অভিমান করছেন তিনি! যে ছেলে অসুস্থ বাপের মুখের দিকে তাকাল না, মায়ের দুর্ভাবনার অংশ নিতে চাইল না, সংসারের প্রতি তার যে অত্যাজ্য দায়িত্ব তার কথা ভেবে দেখল না, তার কাছে দুঃখ জানাতে যাওয়া অর্থহীন। তাই বলে তাকে সব ভার থেকে মুক্তি দেওয়াও যায় না। তাহলে তো সে বেঁচে যায়। 'চাই না' বলে মুখ ভার করে সরে এলে, ও কি তার মর্ম বুঝবে, না মর্যাদা দেবে? মনে মনে বরং নিশ্চিন্ত হবে—ভালোই হলো, তোমাদের দায় আর বইতে হলো না। সে সুযোগ তাকে দেওয়া হবে না।

ছেলের উপর কঠোর হবার চেষ্টা করলেন মালতী। ওকে বোঝাতে হবে, তোমার ভার যেমন আমরা এতদিন ধরে বয়েছি তোমাকে তেমনি আমাদের ভার বইতে হবে। সংসারে কিছু পেতে হলে তার বদলে কিছু দিতে হয়। এটা তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন নয়, এটা তোমার দায়, তোমার অবশ্য কর্তব্য। তোমার কাছে আমরা করুণা ভিক্ষা করছি না, মায়া মমতা স্নেহভালবাসার দাবি তুলছি না, এ আমাদের ন্যায্য পাওনার দাবি। এতকাল তুমি অক্ষম ছিলে, আমরা দিয়েছি, আজ তুমি সক্ষম, তার কিছুটা অন্তত ফিরিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে এই আমাদের সম্পর্ক।

এই কথাগুলো যখন মনে মনে আউড়ে যাচ্ছিলেন, তখন

অন্তরের একটা দিক যেন ভেঙে পড়ছিল। তাঁর অত আদরের খোকা!—তরুণ বয়সে প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ যে এনে দিয়েছিল, তার সঙ্গে জড়ানো কত সাধ, কত স্বপ্ন, কত আনন্দ, কত উৎকণ্ঠা। তাকে কখনো এমন করে বলা যায়? মা কখনো এত রূঢ়, এত নির্মম হতে পারে?

কেন পারবে না? পরক্ষণেই সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে শক্ত করে তুললেন মালতী। ছেলে যখন মুখ ফুটে এই সামান্য কথাটা বলতে পারল না—তুমি ভেবো না মা, আমি তো আছি,—তখন মা-ই বা এই সহজ, সরল, সঙ্গত কথাটা তাকে জানিয়ে দিতে পারবে না কেন?

ভিতরে ভিতরে একটা দৃঢ় সংকল্প নেবার পর অনাবশ্যক দেরি করলে তার তাতটা পাছে জুড়িয়ে যায়, তাই সুবীর রওনা হয়ে যাবার পরেই একটা সুযোগ করে নিয়ে স্বামীর কাছে কথাটা পেড়ে ফেললেন। প্রথমে জানতে চাইলেন, ওখানে তো তোমার অনেক ছুটি পাওনা আছে।

কিছুদিন আগেও এমনি হঠাৎ করে ছুটির কথা তুললে সুহৃদ মনে মনে বিস্ময় বোধ করতেন, মুখেও হয়তো জিজ্ঞেস করতেন, সে কথা কেন। আজ কোনটাই করলেন না। তাঁর সম্বন্ধে স্ত্রীর ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি, চিন্তাধারাটা কোন্ পথে চলেছে, তাও মোটামুটি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই প্রশ্নটা যেন প্রত্যাশিত, এমনি ভাবেই উত্তর দিলেন, তা আছে। তবে প্রাইভেট ফার্ম তো। ওখানে পাওনা আর পাওয়া—এ দুটোতে অনেক তফাৎ।

একবার বলে ছাখ। দেয় ভালো না দেয় এমনি বেরিয়ে চলে এসো।

সুহৃদ এতখানির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তবু বললেন, দিলেও চার মাসের বেশি দেবে না। এদিকে আমার ফ্যাক্টরী ভালো করে

চালু হতে, মানে, আমাদের প্রয়োজন মেটাবার মতো অবস্থায় আসতে এখনো কিছুটা দেরি আছে। তাই ভাবছিলাম—

মালতী কথাটা শেষ করতে দিলেন না, তার আগেই বলে উঠলেন, তদ্দিন খোকা চালাবে।

খোকা তো সবে ঢুকল।

তাহলেও, মাইনেটা তো প্রথম মাস থেকেই পাবে।

সুহৃদ একটু কি ভেবে নিয়ে বললেন, খোকাকে কিছু বলেছ?

মালতীর পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুস্কিল। যদি বলেন, হ্যাঁ, তার পরেই সুহৃদ হয়তো জানতে চাইবেন, কী বলল সে ছেলের সেই কথাগুলো এবং সেই সঙ্গে যে মনোভাব তার প্রকাশ পেয়েছে, সে-সব তিনি নিজের কাছেই রাখতে চান। তাই সরাসরি জবাব না দিয়ে বললেন, সে তো নিজেই সব দেখতে পাচ্ছে।

সুহৃদ প্রসঙ্গটা আর না বাড়িয়ে সংক্ষেপে শুধু বললেন, একবার আঁচ নিয়ে দেখি, কী বলে ওরা।

মালতী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। কথাটা হঠাৎ ধরতে না পেরে বললেন, কারা?

আমার প্রভুদের কথা বলছি।

আমার তো মনে হয় জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করতে গেলেই ওরা নানারকম ফ্যাঁকড়া বের করবে। তার চেয়ে সোজাসুজি দরখাস্ত পাঠিয়ে দেওয়া ভালো। আমার শরীর খারাপ, আমি পেরে উঠছি না, এর পরে আর কথা নেই।

'শরীর খারাপ' কথাটা সুহৃদ এ পর্যন্ত কোনদিন আমল দিতে চাননি। কদিন আগেও চোখ মুখের চেহারা নিয়ে মালতী একটু উদ্বেগ প্রকাশ করতে, বলেছিলেন, বয়স হয়েছে, সেটা ভুলে যাও কেন? এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোর দিয়ে জুড়ে দিয়েছিলেন শরীর আমার ঠিক আছে।

আজ আর স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করলেন না। ভিতরে ভিতরে

নিজেও বুঝতে পারছিলেন, দৈহিক সামর্থ্য কমে আসছে। চাকরি শেষ করে রোজ বিকালের দিকে যখন ফ্যাক্টরীতে গিয়ে বসেন, কোন কোন দিন হাত-পাগুলো চলতে চায় না। তখনি অবশ্য জোর করে চালিয়ে দেন, কিন্তু সেটা মনের জোর। দেহের কলকব্জাগুলো আগেকার মতো কাজ করছে না, অতি-ব্যবহারে যা হয়। পুরনো হয়ে পড়ছে তো। তার উপরে চাপও পড়ছে বেশী। ক্রমশই বোঝা যাচ্ছে, তাঁর ঐ কারখানার যন্ত্রগুলোর মতো দেহযন্ত্রেরও নিয়মিত এবং উপযুক্ত বিশ্রাম দরকার। ছুটির কথা তিনি নিজেও ভাবছিলেন। তার পরের ব্যাপারটা, মালতীর ভাষায় বেরিয়ে চলে আসা, সে সম্পর্কে মনস্থির করতে পারেন নি। ছুটি নেবার প্রশ্নটাও সেই কারণে পিছিয়ে যাচ্ছিল। ছুটির মেয়াদ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরির মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে, মনে এই রকম একটা সংকল্পই করে রেখেছিলেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পুরো মাইনের ছুটি খুব বেশী হবে না, বড় জোর মাস চারেক। তাও দেবে কিনা সন্দেহ। এমনিতেই কারখানাটা কিনবার পর থেকে মালিক পক্ষের মনোভাব বদলে গেছে। ওঁর উপরে তাঁরা তেমন প্রসন্ন নন। সে জন্যে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। তার কোন বেতনভূক কর্মচারী আলাদা ব্যবসায়ে নেমেছে, এটা বোধহয় কোন ব্যবসায়ী পছন্দ করে না। এ ক্ষেত্রেও তাঁদের অসন্তুষ্টির আসল মূলটা সেইখানে। তার থেকে এখানে-সেখানে ডালপালা গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু সুহৃদের বিবেক এখানে একেবারে পরিষ্কার। তাঁর তরফ থেকে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা ত্রুটি কোথাও দেখা দেয় নি। যদি কিছু ঘটে থাকে, সেটা তার অক্ষমতা। আগেও ঘটতে পারত, তার সঙ্গে তাঁর কারখানার কোনো সম্পর্ক নেই।

যা-ই হোক, সুহৃদ ভেবে রেখেছিলেন, ছুটিটা এমন সময়ে নেবেন যে তাঁকে আর ফিরে যেতে না হয়, অর্থাৎ ছুটি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে চাকরির উপরে তাঁর যে নির্ভরতা তারও অবসান ঘটবে। সেটা

আবার নির্ভর করছিল তাঁর নতুন ব্যবসার উপর। তাই দেরি করছিলেন।

সুবীরের চাকরিও তিনি হিসাবের বাইরে রাখেন নি। এ ব্যাপারে তারও একটা প্রধান স্থান রয়ে গেছে। তাঁকে এবং তাঁদের সবাইকে একমাত্র ফ্যাক্টরীর মুখ চেয়েই বা থাকতে হবে কেন? ছেলেও তো দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু ছেলের উপর শুরু থেকেই সংসারের চাপ পড়ে, এটা তিনি এড়াবার চেষ্টায় ছিলেন। সেই জন্যে ভেবেছিলেন, যাক কয়েক মাস, একটা ভালো অর্ডার পেয়েছিলেন, সে মালগুলো তৈরী হতে থাক, ওদিকে সুবীরও খানিকটা গোছগাছ করে নিয়ে, যাকে বলে সেটেল্‌ড হয়ে, বসুক। তখন ছুটির ব্যবস্থা করা যাবে। শুধু ছুটি নয়, একেবারে বেরিয়ে চলে আসা—স্ত্রীর যেটা একান্ত ইচ্ছা এবং তাঁরও যেটা বরাবরের প্ল্যান।

কিন্তু মালতী যে-রকম অস্থির হয়ে উঠেছে, এ ব্যাপারে তাঁকে আরো খানিকটা তৎপর হতে হলো। নিজের শরীর এবং স্বাস্থ্যের কথাটাও না ভেবে পারলেন না। কিছুদিন থেকে কোমরে একটা ব্যথা টের পাচ্ছিলেন, গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। বাত-টাত হবে হয় তো। কদিন হলো বুকের বাঁ দিকটাও মাঝে মাঝে খচ্‌ করে ওঠে। তাকেও বিশেষ আমল দেননি। আজ ভাবলেন, কোনটাকেই বোধহয় একেবারে তুচ্ছ করা উচিত নয়। মালতীকে অবশ্য বলা হবে না। এমন ভয় পেয়ে যাবে যে, ওকে নিয়েই আবার নতুন সমস্যা দেখা দেবে। তবে বিভূতিকে একবার বললে হয়। ছেলেবেলাকার বন্ধু, বিচক্ষণ ডাক্তার। তাকে বলতে দোষ নেই।

ঠিক দুদিন পরে রাত্রে শুতে যাবার আগে মালতী বললেন, দিয়েছ?

"কি?" প্রশ্নটা হঠাৎ ধরতে পারলেন না সুহৃদ।

ছুটির দরখাস্ত।

ও, তাই তো। কি করবো, একেবারে সময় পাইনি। একটা মেসিন এমন বিগড়ে বসল, ছুটো দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেছে টেরই পাইনি। তারপর আবার—

থাক; বলে, মালতী জোরে জোরে পা ফেলে ওদিকে কোথায় গিয়ে ঢুকলেন।

সুহৃদ হাসতে হাসতে ঘরে চলে গেলেন এবং পরদিন অফিসে গিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকে প্রথম কথা যেটা পাড়লেন, সেটা তাঁর ছুটি: ও তরফে বেশী কিছু আপত্তি উঠল না। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না শুনে ভদ্রলোক ববং যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন এবং ডাক্তার দেখাবার পরামর্শ দিয়ে শেষের দিকে বললেন, ইউ লুক এ বিট্ রান্ ডাউন। কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

একটু সকাল সকাল বেরিয়ে ওখান থেকে প্রথমেই গেলেন বিভূতি সেনের চেম্বারে। মোটামুটি পরীক্ষার পর ডাক্তার যা বললেন, একেবারে তাঁরই কথা। এই মাত্র সেদিন মালতীকে তিনি নিজেও ঠিক এই কথা কটিই বলেছিলেন—বয়স হয়েছে, ভুলে যাও কেন?

প্রেস্‌ক্রিপশন্ লিখতে লিখতে ডাক্তাব সেন বললেন, অত খাটুনি চলবে না। ছুটি নাও।

সেই ব্যবস্থা করেই আসছি তোমার কাছে। গিন্নীর প্রেস্‌ক্রিপশন। উনি তোমার চেয়েও বড় ডাক্তার।

আসল ডাক্তারি ওঁরাই করেন; আমরা তো সাকরেদ মাত্র। ছুটি নিয়ে এই মহানগরী ছেড়ে মাস তিনেকের মত যদি পালাতে পার, আরো ভালো হয়।

সেটা পারবো না ভাই।

কেন?

ছয়োরাণী রয়েছে যে।

ছুয়োরাণী !

মানে, আমার ঐ কারখানাটা। আহা বেচারা! ওর দিকে মোটেই নজর দিতে পারি না।

ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, বেশী নজর দিতে গেলে সুয়োটি যে চটে যাবেন।

যাবেন কি? গোড়া থেকেই চটে আছেন। তবে এতদিনে অনেকটা সয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ গল্প-সল্প করে সুহৃদ যখন উঠতে যাবেন, ডাক্তার সেন বললেন, শোন, তোমার ঐ 'ছুয়ো' নিয়েও বেশী মাতামাতি করো না। ছুটি বলতে আমি কিন্তু পুরোপুরি ছুটির কথাই বলছিলাম। না; ভাবনার কিছু নেই, তবে একটু সাবধান হতে দোষ কি?

দিন পনের পরে আবার আসবার নির্দেশ দিয়ে ডাক্তার বন্ধুকে বিদায় করলেন।

সুহৃদ একটু ভাবনা নিয়েই ফিরলেন। রাস্তা থেকে ওষুধটা কিনে নিলেন। মনে করেছিলেন, ছুটির বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, এই খবরটা ছাড়া মালতীকে আর কিছু জানাবেন না। কিন্তু ওষুধের সূত্র ধরে খানিকটা বলতেই হলো। ডাক্তারের উক্তির প্রথমাংশ —অর্থাৎ ভাবনার কিছু নেই, সুরুতেই জানিয়ে দিলেন; শেষের অংশ, যেখানে সাবধান হবার পরামর্শ দিয়েছেন, অনুক্ত রয়ে গেল। তা হলেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্বামীর মুখ থেকে আরো কিছু সংগ্রহ করলেন মালতী এবং সেই অনুসারে তাঁর খাওয়া-দাওয়া পরিচর্যা সম্পর্কে একটা কার্যক্রমও মনে মনে স্থির করে ফেললেন।

পরের দিনটা আর কারখানায় যাওয়া হয়নি। দারোয়ান কিছু চিঠিপত্র বাড়িতে রেখে গিয়েছিল। সুহৃদ এদিকের কথাবার্তা সেরে কফির পেয়ালা হাতে করে বসবার ঘরে গিয়ে একটা ইজি চেয়ারে বসে সেইগুলো দেখছিলেন।

শিখা এসে একটা খাম তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে বলল, বাবা, তোমার চিঠি।

কে দিল?

ডাকে এসেছে; মার কাছে ছিল। কি রকম মোটা, বড় খাম দেখেছ? ঠিকানাটা আবার টাইপ করা।

তাই তো দেখছি। বাড়ির ঠিকানায় আবার টাইপ করে চিঠি লিখল কে?—বলতে বলতে একটা ধার ছিঁড়ে ফেললেন।

শিখার কৌতূহল তখন খাম থেকে তার ভিতরকার বস্তুটি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল, বাবার মুখখানা ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছে। চিঠিটা বিশেষ বড় নয়।

পড়া শেষ করে মুখ তুলতেই শিখা বলল, কার চিঠি বাবা?···

তার কণ্ঠে উৎকণ্ঠার সুর সুস্পষ্ট।

সুহৃদ সে কথার জবাব দিলেন না, বললেন, তোর মা কী করছেন?

মা রান্না ঘরে।

বোধহয় বলতে যাচ্ছিলেন, একবার আসতে বল—শিখার সেই রকম মনে হল—কিন্তু বললেল না। চিঠিখানা খামে ভরে পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, আচ্ছা এখন থাক। তুই যা।

শিখার কৌতূহল তখন আশঙ্কার স্তরে পৌঁছে গেছে, এবং সেটি মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে তার একটুও বিলম্ব হলো না। তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে এলেন—কার চিঠি গো?

সুহৃদ জবাব দিলেন না, হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা স্ত্রীর হাতে দিলেন। মালতী প্রথমেই মাথার দিকের ছাপানো অংশটা দেখে নিলেন। নামটা অপরিচিত, ঠিকানা, সুবীর যেখানে কাজ করে, সেখানকার। বললেন, কে ইনি?

পরিচয়টা নামের সঙ্গেই আছে।

মালতী পড়লেন, চীফ এঞ্জিনিয়ার। জিজ্ঞাসা করলেন, কী লিখেছেন?

পড়ে গ্যাখ।

চিঠিটা বাংলায় লেখা, এবং তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ চমৎকার একটি ভূমিকা দিয়ে শুরু করেছেন দত্তসাহেব। লিখেছেন, "বাংলা ভাষায় আমার দখল অতি সামান্য। সেই কারণে এ চিঠি ইংরেজিতে লিখিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, যাহাতে মনের ভাব উত্তম রূপে প্রকাশ করিতে পারি। কিন্তু আমার স্ত্রী তাহাতে আপত্তি জানাইলেন। তাঁহার মতে এই জাতীয় শুভ কার্যের প্রস্তাব দেশীয় ভাষাতে করাই বাঞ্ছনীয়। যদিও এ-বিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তথাপি ভুল-ত্রুটি থাকিতে পারে। আশা করি ক্ষমা করিবেন।"

আসল বক্তব্য কয়েক লাইনেই শেষ করেছেন মিষ্টার দত্ত।

সুবীর এবং সুতপা দুজনেরই মন জানতে পেরে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাদের আকাঙ্খিত মিলনে সম্মতি দিয়েছেন এবং তাঁদের বিশ্বাস, মিষ্টার ও মিসেস রুদ্রও খুশী হয়ে সম্মত হবেন।

শেষের দিকে রুদ্র দম্পতিকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে— 'আপনারা আসিয়া আমার কন্যাটিকে আশীর্বাদ করিলে বাধিত হইব। সেই সুযোগে আমরাও আপনাদের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিব।'

তাঁর নিজের আসবার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কতগুলো জরুরী কাজে আটকা পড়ে যাওয়ায় আসা হল না, বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

চিঠি পড়তে মালতীর বেশী সময় লাগল না। তারপর দুজনেই নীরব। ওদিকের ইজিচেয়ারে তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন সুহৃদ, আর এদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলেন মালতী। শিখাও এসে মায়ের পিছনে দাঁড়িয়েছিল, যদিও ব্যাপারটা কিছুই আঁচ করতে পারেনি। রান্নাঘর থেকে একটা কি পোড়া গন্ধ নাকে যেতেই ছুটে চলে গেল।

অনেক্ষণ পরে মালতী অনেকটা যেন আপন মনে বললেন, এ আমি জানতাম।

সুহৃদ হঠাৎ সচকিত হলেন, খোকা কিছু বলেছিল নাকি?

না। না বললেও এই রকম একটা কিছু ঘটবে আমার মনই আমাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু চাকরি পেতে না পেতেই—

বাকীটুকু আর শেষ করলেন না। সুহৃদ বললেন, থাক, ওসব ভেবে আর লাভ নেই। এখন অন্য ভাবনা। চিঠির শেষ দিকটা দেখেছ?

দেখেছি।

একবার তাহলে যেতে হয়।...অবিশ্যি না গেলেও কিছু আটকাবে না। আমাদের সম্মতি বা আশীর্বাদের জন্যে ওঁরা বসে থাকবেন, সেই সম্ভাবনা নেই। তবু বিয়েটা তো শুধু বিয়েতেই শেষ নয়। তার পরেও যে অনেকখানি। না যাওয়া মানে হয়তো গোটা জীবনের সবটা থেকে সরে আসা, এবং সরিয়ে দেওয়া।

তুমি কি আশা কর, গেলেই ঐ ছেলে-বৌ আমাদের কাছে সরে আসবে? এই কি তার লক্ষণ?

না, সে আশা আমি করি না। তবু নিজেদের আমরা এই কথা বলে বোঝাতে পারবো, আমাদের দিক থেকে যা করবার আমরা করেছি। তবে, তোমাকে আমি যেতে বলি না। এ তো কনে পছন্দ করতে যাওয়া নয়। এক্ষেত্রে আমি একা গেলেই চলবে।

তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না? উনি যেমন করেছেন, তেমনি একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দাও, আমাদের অমত নেই।

শেষ দিকটায় গলাটা একটু কেঁপে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন কারো কোনো কথার প্রতিবাদ করছেন, এমনি ভাবে বললেন, না, না, অমত করবো কেন? খোকা যদি একবার এসে বলত, মা, একটি মেয়েকে আমি পছন্দ করেছি, তার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও, আমি কি বলতাম আমার মত নেই?

বলতে বলতে মালতীর গণ্ড বেয়ে জল গড়িয়ে এলো। তাড়াতাড়ি আঁচলে মুছে ফেললেন।

সুহৃদ বললেন, আমিও ভাবছিলাম। বলতে কী বাধা ছিল? ছেলেটা ভিতরে ভিতরে বড় দুর্বল, বুদ্ধিসুদ্ধিও কম। হয়তো সেই জন্যেই···যাকগে। তুমি যা বলছ, তা করা যেত যদি মেয়েটিকে আমরা আগে একবার দেখতাম বা তার সম্বন্ধে কিছু জানতাম। উনি তো আমাদের ছেলেকে অনেক দিন ধরে দেখেছেন, চিনেছেন, তারপর পছন্দ করেছেন।

মালতী স্বামীর যুক্তিটা বুঝলেন। কিছু না দেখে বা জেনে মত দেওয়া মানে প্রকারান্তরে বলা—কী প্রয়োজন ছিল আমার মত চাইবার? আসল কথাটা যদিও তাই, কিন্তু বলতে গেলে সভ্য সমাজের সৌজন্যে বাধে।

পরের সপ্তাহেই সুহৃদ গিয়ে 'কনে দেখে' এলেন। যদিও জানতেন, 'বর কনে আশীর্বাদ' বা 'পাকা দেখা' বলে যে প্রচলিত অনুষ্ঠান তার এখানে কোনো অবকাশ নেই, 'আশীর্বাদ' বলতে মিষ্টার দত্ত সেটা বোঝাতে চাননি, তবু একটা জড়োয়া নেকলেস নিয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে কেসটা তার হাতে তুলে দিলেন।

জলযোগান্তে ছেলের নতুন বাসায় গিয়ে তার স্বাস্থ্য এবং কাজ-কর্ম সম্বন্ধে সামান্য দু-একটা প্রশ্ন করে গাড়ি ধরবার জন্যে উঠে পড়লেন আর কোনো কথা হলো না।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামতেই একটি ছেলে হাসি মুখে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল, এবং উনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে, বলল, আমার নাম নিলয়, সুবীর আমার বন্ধু।

হ্যাঁ, হাঁ, তোমার কথা ওর মুখে শুনেছি। একবার এসো না আমাদের বাড়ি? আমরা সবাই খুব খুশী হবো।

যাবো। আপনি কি এখনি চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

কোলকাতায় ফিরতে বড় অসময় হয় যাবে। তার চেয়ে এখানে দুটো খেয়ে দেয়ে—

না, বাবা, ওখানে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

নিলয়ের কাঁধে ডান হাতটা রাখলেন। সে বলল, চলুন আপনাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

সম্মতির অপেক্ষা না করেই ওঁর হাত থেকে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যাগটা তুলে নিল। সুহৃদ আর আপত্তি করলেন না। কাছেই ষ্টেশন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন।

গাড়িতে উঠবার পর আরেকবার ওকে যাবার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

প্রথম এবং এত সামান্য পরিচয়ে ছেলের বন্ধুকে এমন করে বারংবার আমন্ত্রণ জানাবার আগ্রহ অন্য সময়ে অন্য পরিবেশে প্রকাশ করতেন কিনা, সন্দেহ। কিন্তু এই মুহূর্তে এর জন্যে ভিতরে যেন একটা তাগিদ বোধ করেছিলেন। হয়তো তার কারণ—প্রথম দেখেই ছেলেটিকে ভাল লেগেছিল। অথবা নিজের ছেলেকে আশ্রয় করে তাঁর মনে যে ক্ষোভ এবং বেদনা অজ্ঞাতসারে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, একটি পরের ছেলের এই সামান্য একটু অমায়িক ব্যবহার তার উপরে যেন একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দিয়ে গেল।

ফেরবার পর মালতী ওখানকার সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানতে চাইলেন না। সুহৃদ ভেবেছিলেন, মেয়েটি কেমন দেখলে—এ কথাটা হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন। তাও করলেন না। মায়ের অগোচরে শিখা একবার জানতে চেয়েছিল। উত্তরে সুহৃদ বলেছিলেন, ভালোই তো দেখলাম।

বিয়ের তারিখ পাত্রী পক্ষ আগেই স্থির করেছিলেন, এবং মিসেস মিত্র সেটা ওখানেই ভাবী বৈবাহিককে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সবাইকে নিয়ে যাবার অনুরোধও করেছিলেন। পরে ডাক যোগে

ইংরেজীতে ছাপা একটা কার্ডও এসেছিল। কিন্তু কারোই যাওয়া হয়নি। সুহৃদের কর্তব্যেবোধ তাঁকে যে কথাই বলুক, স্ত্রীর দিকে চেয়ে, তাঁর মনের অবস্থা উপলব্ধি করে ওকথা আর তোলেননি। তাছাড়া, দত্তদম্পত্তির সঙ্গে কথাবার্তায় এটা বুঝেছিলেন, তাঁদের সমাজের যে রীতিনীতি এবং বিবাহের কর্মসূচী যে-ভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, তার কোনখানে পাত্রের পিতার বা আত্মীয়-স্বজনের কোনা বিশেষ· স্থান নেই। অন্য দশজন নিমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে তিনিও একজন। তাঁদের অনুপস্থিতি উৎসবের কোথাও কোনো অঙ্গহানি ঘটাবে না। কেউ সেটা বোধও করবে না। বরং ঐ অস্বাভাবিক এবং অনভ্যস্ত পরিবেশে বাবা কিংবা ভাইবোনের উপস্থিতি সুবীরকে হয়তো একটু বিব্রত করে তুলত। তারা কেউ না থাকলেই সে, ইংরেজীতে যাকে বলে ফ্রী, অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।

এ বিষয়ে সুনীতের মনোভাবও অনেকটা তার বাবার মত। দাদা এবং ভাবী বৌদির মধ্যে যদি কোনো পূর্বরাগ হয়ে থাকে, সেটা অন্যায় নয়, তাতে আপত্তি করারও কিছু নেই। কিন্তু শুরু থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা যে রূপ নিয়েছে, যে ভাবে অগ্রসর হয়েছে, কোনোটাই সে সমর্থন করতে পারে না। সমর্থন-যোগ্য যদি কিছু থাকত, তাহলেও সে দিকটা সে দেখত না। এর থেকে মা যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন, যে বেদনা নিঃশব্দে বহন করে বেড়াচ্ছেন, সেইটাই তার কাছে সব চেয়ে বড়। সেই বিশেষ কোণ থেকেই সে এই বিবাহ-সংক্রান্ত সমস্ত অধ্যায়টাকে বিচার করে দেখেছিল। এতে যোগ দেওয়া দূরে থাক, এর সঙ্গে কোনো সংস্রবও ছিল তার বিবেচনার বাইরে।

বৌভাতের কোনো আয়োজন এঁরা করেননি। সে মনের অবস্থা কারো ছিল না। তাছাড়া সামান্য কিছু করলেই কিছু আত্মীয়-স্বজন অন্তত ডাকতে হয়। তাঁদের প্রকাশ্য সমালোচনা

যদি বা সওয়া যায়, সান্ত্বনা বা সহানুভূতি একেবারে অসহ্য। একেই তো নিউ সাউথ পার্কের বড় লোকের পাড়ায় বাড়ি নিয়ে এঁরাও যে বড় লোক হয়ে গেছেন, গরীব আত্মীয়দের দূরে ঠেলে দিয়েছেন, এই রকম রটনা প্রায়ই কানে আসত, (আসলে যদিও মালতীই মাঝে মাঝে উত্তরে গিয়ে তাঁদের খোঁজ-খবর নিতেন, তাঁদের কেউ দক্ষিণাভিযান করতেন না) তার উপরে এই বৌ দেখে, বিয়ের ইতিহাস খানিকটা শুনে, বাকীটা আন্দাজ করে শুভানুধ্যায়ীরা ইনিয়ে-বিনিয়ে যে-সব বাক্যসুধা বিতরণ করতে থাকবেন, সেধে যেচে সেটা পান করবার আগ্রহ কারোই থাকতে পারে না। সুহৃদ বা মালতীরও ছিল না। এখানকার প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁদের আলাপ হয়নি, অগ্রণী হয়ে আলাপ করা এ পাড়ার রীতি নয়, এরা কারো সাতে-পাঁচে থাকেন না। সেই বদ্ধ-ওষ্ঠ আভিজাত্যকে মালতী এতদিন সুনজরে দেখেননি, আজ-প্রাণ ভরে অভিনন্দন জানালেন। কারো সরব কৌতূহলের সামনাসামনি হতে হবে না।

বাড়িওয়ালাদের কথা আলাদা। শিখার কাছ থেকে অঞ্জলি, এবং অঞ্জলির মুখ থেকে তার মা যে-টুকু শুনেছিলেন, সেটা খুব বেশী কিছু নয়। ভিতরে ভিতরে যাই ভাবুন, প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'ও-রকম আকছার হচ্ছে আজকাল। এই তো সেদিন—' বলে দু-তিনটি দৃষ্টান্তও দিয়েছিলেন যেগুলো অন্যের মুখে শোনা নয়, তাঁর প্রত্যক্ষ গোচর। এ সম্পর্কে মালতীর কাছে নিজের মতামত-ও ব্যক্ত করেছিলেন সরকার গৃহিণী—'যে যাই বলুক ভাই, আমার মনে হয়, ছেলে যে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে, এটা এক দিক দিয়ে ভালো। ঠাকুর না করুন, এর পর যদি বনিবনাও না হয়, কাউকে দুষতে পারবে না। বাপ-মা যাকে ধরে এনে দেয়, যতই দেখে-শুনে আনুক, সকলের কপালে ওৎরায় কি? এই আমার অবস্থা ছাখনা? কত বড় বনেদি ঘরের মেয়ে আমি, দেখতেই বা এমন কী খারাপ ছিলাম বয়সকালে, কী করলেন আমার বাবা?

কত খোঁজাখুঁজি করে, ঠিকুজি-কুষ্ঠী মিলিয়ে এই তো হলো! সারাটা জীবন—'

কে একজন এসে পড়াতে কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না।

বিশ্বনাথ তাঁর ভাড়াটে পরিবারটিকে আরো একটু অন্তরঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে মালতীর আশা-আকাঙ্খা, সাধ-অভিলাষ তাঁর অজানা ছিল না। স্বামী-পুত্র-কন্যার মধ্যে যিনি নিজেকে প্রায় বিলীন করে দিয়েছেন, তাঁর কাছে এযে কত বড় বিপর্যয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই এ প্রসঙ্গে একেবারে নীরব ছিলেন। মালতীর সঙ্গে কখনো কখনো তাঁর সাক্ষাৎ হতো। ইদানীং ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছেন। ভাড়াটা বরাবর তিনি নিজে এসে নিয়ে যেতেন। সুহৃদ অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। তাঁর উপরে পাঠাবার ভার না চাপিয়ে এ ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। বলেছিলেন, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার যখন দরকার পড়বে ওপরে গিয়ে চেকটা নিয়ে আসবো। আপনার অবসর বুঝেই যাবো। এমনিতে তো দেখাশুনো বড় একটা হয় না। তবু ঐ উপলক্ষে দুটো কথাবার্তা হবে।

পরের মাসে ভাড়া নিতে যেদিন এলেন, এ-কথা ও-কথার পর বললেন, ছেলেকে লিখে দিন, বৌ নিয়ে একদিন আসুক। আপনি তো আগেই দেখেছেন, আমরা একবার দেখবো না?

সুহৃদ মৃদু হেসে বললেন, দেখবেন বৈকি? আমি লিখে দিয়েছি।

আপনি বিচক্ষণ এঞ্জিনীয়ার। প্রতিটি সূক্ষ্ম জিনিসে নজর আছে। যদি অনধিকার চর্চা বলে মনে না করেন তো আরেকটা কথা বলতে চাই।

নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমাদের আপনি যে চোখে দেখেন, সেখানে অনধিকারের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ভবিষ্যতের একটা প্ল্যান্ সকলের মনেই থাকে। আপনারও

একটি ব্লু-প্রিন্ট তৈরী হয়ে আছে, জানি। তার কিছুটা আভাস আমি পেয়েছি। এই যা ঘটে গেল, তার জন্যে কি সেখানে কোনো রকম অদল-বদলের কথা ভাবছেন?

না; আমার তরফে এখনো তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

এই উত্তরই আপনার কাছে আশা করেছিলাম, মিস্টার রুদ্র। প্রার্থনা করি যেন কোনোদিনই সে প্রয়োজন না দেখা দেয়।

॥ সাত ॥

বিভিন্ন দেশের কবিরা জীবনকে গানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁদের মতে এ দুয়ের মিল বা ঐক্য শুধু ভাবগত নয়, গঠনগত। সঙ্গীতের মত জীবনও নানাসুরে গাঁথা—কখনো লঘু কখনো রাগ-প্রধান ; বিভিন্ন তার স্বরগ্রাম—কোথাও কড়ি, কোথাও কোমল। মিল রয়েছে গতি এবং লয়েতেও।

রুদ্র-পরিবারের জীবন-ছন্দে এমনিধারা কোনো মিল যদি দেখানো যায়, সেটা ঐ লয়ের মিল। প্রথম দিকটা ছিল 'বিলম্বিত', উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেমন আলাপ, হঠাৎ সেটা 'দ্রুত' স্তরে গিয়ে পৌঁছল, এবং সে পরিবর্তন দেখা দিল সুবীরের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে। সুনীত এম-এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়ে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের অধীনে রিসার্চ শুরু করেছিল। আরো অন্তত বছরখানেক নিয়মিত কাজ করতে পারলে তার থিসিস শেষ হবার কথা, এবং অধ্যাপক ধর আশা প্রকাশ করেছিলেন ডক্টরেট্ পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হবে না। গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার সাহিত্য-চর্চাকেও ইদানিং কিছুটা পিছিয়ে আসতে হয়েছিল।

নিজের অভিপ্রেত পথে ছেলেকে আনতে পারেননি বলে সুহৃদের মনে গোড়াতে যে ক্ষোভ ছিল, সেটা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। সে যা, তা-ই হোক। তার নিজের পথেই কৃতী ও সার্থক হয়ে উঠুক।

এবারে প্রথম ঘা পড়ল সেই সুনীতের উপর। বাবা-মা বা অন্য কারো হাত থেকে নয়, সম্পূর্ণ স্বয়ং-দত্ত। বাবার স্বাস্থ্যের অবনতি সে-ও লক্ষ্য করেছিল। তার উপরে দাদার বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনাবলী যে ছাপ ফেলেছিল, সেটা যতই তিনি লুকিয়ে রাখতে

চেষ্টা করুন না কেন, তার দৃষ্টি এড়ায় নি। সুবীরের উপর অনেকখানি নির্ভর করেই যে মা তাঁকে ছুটি নেবার জন্যে বারংবার পীড়াপীড়ি করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজী করাতে পেরেছেন, সেটা সে জানত। সে খুঁটি যখন টিকল না, সুনীত দেখতে পেল সংসারকে খাড়া রাখবার জন্যে আগের মত চাকরি এবং ফ্যাক্টরীর ডবল ভার অনিবার্য ভাবে আবার সেই বাবার কাঁধে এসে পড়ছে। এ অবস্থায় তার আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা চলে না। বাবা-মা হয় তো চান না তার কার্য-সূচীর কোনো পরিবর্তন হোক, তবু এক্ষেত্রে তার অবশ্যই কিছু করণীয় আছে, এবং সে বিষয়ে সে অবিলম্বে মন স্থির করে ফেলল। বাড়ির কাউকে কিছু জানতে দিল না, শুধু অধ্যাপক ধরকে গিয়ে সব কিছু খুলে বলল এবং সেই সঙ্গে তার সংকল্পটাও জানিয়ে দিল—রিসার্চ্ বন্ধ রেখে আপততঃ একটি চাকরি।

এই রকম একটি মেধাবী ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সাফল্যের মুখে এসে ওলট-পালট হয়ে যাবে, এটা ডক্টর ধরের কাছে বেদনাদায়ক। কিন্তু তার কর্তব্য-জ্ঞানকেও তিনি মনে মনে প্রশংসা না করে পারলেন না। বললেন, আচ্ছা, আমি তোমার চাকরির চেষ্টা করছি, তবে এক সর্তে—যখনই দেখবে, তোমার রোজগার ছাড়াই মোটামুটি ভাবে সংসার চলে যাচ্ছে, তখনই এখানে ফিরে আসবে।

ডক্টর ধর তাকে স্নেহ করেন, তার পরম শুভাকাঙ্খী, এটুকু সুনীতের অজানা ছিল না, কিন্তু সেটা যে কত গভীর এবং সুদূরপ্রসারী, এর আগে এমনভাবে কখনো অনুভব করেনি। কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে রইল। তারপর বলল, আমি যত শীগগির পারি চলে আসবো স্যর।

অধ্যাপকের আনুকূল্যে চাকরি পেতে দেরি হলো না। বেহালা অঞ্চলে একটা নতুন বেসরকারী কলেজের লেকচারার। নতুন বলে মাইনে তেমন ভালো নয়—দেড়শ টাকা। কলকাতার বাইরে

যেতে পারলে আরো কিছু বেশী পাওয়া যেত। কিন্তু তাতে ওর কোনো সুবিধা নেই। আপাতত এতেই সে খুশী। দাদাও হয়তো এর চেয়ে বেশী কিছু দিতে পারত না।

নিয়োগপত্র পেয়েই মাকে গিয়ে বলল, মা, আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

চাকরি! চমকে উঠলেন মালতী।

হ্যাঁ; বেহালা-কলেজে। এখান থেকে বেশী দূর নয়।

তোর রিসার্চ কী হল?

ডক্টর ধর অন্য কতগুলো কাজে এমন জড়িয়ে পড়েছেন, যে এদিকে বিশেষ নজর দিতে পারছেন না। তাই কিছুদিন বন্ধ রাখতে বললেন। চাকরিও উনি করে দিয়েছেন।

চাকরির খবর জানালেই মা যে রিসার্চের কথা জিজ্ঞাসা করবেন, এটা অনুমান করতে পেরেছিল এবং সেই জন্যে আগে-ভাগে তার একটা উত্তরও মনে মনে তৈরি করে রেখেছিল। রিসার্চ তার বহু দিনের স্বপ্ন; মা তা জানতেন। এ সম্পর্কে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে কথা হত এবং বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে সে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠত। তাই নিয়ে একদিন তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'বাপ-ব্যাটায় মিলেছে বেশ। একজনের মুখে শুধু ফ্যাক্টরী, আরেকজনের মুখে তেমনি রিসার্চ।' সুনীতের আশঙ্কা ছিল, মা তার এই বানানো গল্পটা বিশ্বাস করবেন কিনা। অন্য সময়ে হলে হয়তো এ নিয়ে আরো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। কিন্তু এখন তাঁর মন অহরহ শুধু একটা কথাই ভাবছিল, স্বামীর ছুটি ফুরিয়ে গেলে, তারপর? তিনি নিশ্চয়ই চাকরিতে ফিরে যেতে চাইবেন। তখন তাঁকে বাধা দেবেন কোন জোরে? সুনীতের চাকরি সেই মহা সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। আপাতত এই ভেবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

সুহৃদ যখন শুনলেন, মনে মনে সন্দিগ্ধ না হয়ে পারলেন না।

ছেলেকে ডেকে ছু'চারটি প্রশ্ন করে সন্দেহ আরো বাড়ল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষণার নিয়মকানুন সম্পর্কে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলেও সুনীত তার রিসার্চ বন্ধ হবার যে কারণ দেখাল, সেটা বড় অবাস্তব বলে মনে হলো। অধ্যাপকের যত কাজই থাক, যে-ছাত্রকে তিনি এতদিন ধরে সাহায্য করে এসেছেন, সেটা মাঝপথে এমন করে বন্ধ করে দিতে পারেন না। সুনীত নিশ্চয়ই দাদার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চায়। তার পরের কথাতেই সেটা আরো পরিষ্কার হল। বলল, কোম্পানীকে লিখে দিয়েছ, তুমি আর জয়েন করছ না?

এখনো দিইনি।

আমার মনে হয় আর দেরি না করে এখনই জানিয়ে দেওয়া উচিত। ওদের আবার নতুন লোক খুঁজতে হবে তো।

এই বলেই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সুহৃদের একবার ইচ্ছা হল, ওকে ডেকে ফিরিয়ে বলেন, 'তুই তোর রিসার্চে ফিরে যা। অন্যের জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিস না। আমি যেমন করে হোক চালিয়ে নেবো।' বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। নিজের মধ্যে জোর পেলেন না। না দেহে, না মনে। ছু'দিন আগেই ডাক্তার সেন তাঁকে আরেকবার সাবধান করে দিয়েছেন। বলেছেন; তোমার কারখানার জন্যে একজন ভালো লোক রাখো, যে তোমার কাজের ভারও খানিকটা নিতে পারে। সুহৃদ 'দেখি' বলে চলে এসেছেন। কিন্তু সেদিকে কোন চেষ্টাই করেননি। একজন এঞ্জিনিয়ার পুষবার মত অবস্থায় তিনি এখনো পৌঁছতে পারেননি। এদিকে কাজের চাপও বাড়ছে।

সুনীতের কথা যখন ভাবছেন, তখন শিখা এসে তাঁকে আরো অবাক করে দিল। তার আই-এ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছে। বাংলায় অনার্স নিয়ে বি-এ পড়বে, এই কথাই জেনে এসেছেন বরাবর। ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি।

যা খুশি পড়ুক। এদিকে বিয়ের চেষ্টা চলতে থাকবে। মালতীরও সেই মত। কোন দিকে কতটা খরচের সাশ্রয় করা যায় ভাবতে গিয়ে একবার তাঁর একথাও মনে হয়েছিল, আর পড়িয়ে দরকার কী? বরং তাড়াতাড়ি করে বিয়েটাই দিয়ে দিলে হয়। এ-ই সময়। যত বয়স বাড়ে আর সেই সঙ্গে একরাশ পড়াশুনোর চাপ পড়ে, মেয়েদের চেহারায যে একটি স্নিগ্ধ কমনীয়তা আছে, তার অনেকটা চলে যায়। তাঁর মেয়ের অবশ্য সে বয়স হয়নি। মুখখানা লাবণ্যে ভরপুর, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওটা থাকতে থাকতেই একটি যোগ্য পাত্রের সন্ধান করা ভালো।

কিন্তু পরীক্ষার ফল বেরোবার পর পড়া ছাড়িয়ে দেবার কথা আর ভাবেননি। পড়তে চাইছে পড়ুক। সুহৃদও বললেন, নিশ্চয়ই; পড়বে বৈ কি?

কোন্ কলেজে দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে যখন খোঁজ-খবর নিচ্ছেন, সে এসে বলল, আমাকে লেডী ব্রাবোর্ণে ভর্তি করে দাও বাবা। বি-কম পড়বো।

বি-কম!

হ্যাঁ; অনার্স নেবো কমার্সে।

পারবি? বড় কঠিন আর নীরস সাবজেক্ট। খাটতে হবে।

খাটবো।

বাংলা কিংবা ইংরেজি নিলেই তো ভালো হত। কমার্স-টমার্সে তো তোর কোনো ঝোঁক ছিল না। কোনো উদ্দেশ্য আছে, না, এমনিই পড়তে চাইছিস্?

শিখা মাথা নিচু করে সলজ্জমুখে আঁচলের একটা কোণ আঙুলে জড়াতে লাগল, জবাব দিল না। সুনীত ছিল পাশের ঘরে। বেরিয়ে এসে বোনকে তাড়া দিল, চুপ করে আছিস কেন? বল না?

"তুমি বল", সঙ্গে সঙ্গে অনুনয়ের সুরে সে ভারটা সে দাদার উপর চাপাল। সুনীত হাসিমুখে বলল, ওর প্ল্যান্ হচ্ছে বি-কম পাশ

করে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়বে, তারপর তোমার ফার্মে অ্যাকাউন্ট্যান্ট্ হবে।

সুহৃদ হেসে উঠলেন, "এইবার ঠিক হয়েছে।"

তারপর ছদ্ম গাম্ভীর্যের সুরে মাথা নেড়ে বললেন, না বাপু আমার গরীব ফার্ম অতবড় অ্যাকাউন্ট্যান্ট্ পুষতে পারবে না। মাইনে দেবো কোত্থেকে?

তোমার ফার্ম কি বরাবরই গরীব থাকবে না কি?

তা বটে। তুমি যদ্দিনে পাশ করে বেরোবে—

কে কী পাশ করে বেরোবে? বলতে বলতে মালতী এসে ঢুকলেন।

তিনি এতক্ষণ নিচে ছিলেন। সরকার-গিন্নী কয়েকবার ঘুরে গেছেন, ওঁরও একবার যাওয়া উচিত, তাই গিয়েছিলেন। সুহৃদ তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমাদের শিখারাণী।

কী পাশ করবে?

এবার জবাব দিল সুনীত, অনেক বড় ব্যাপার—চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি। পাশ করে আবার আর্টিকলড্ থাকতে হয়।

মালতী মেয়ের দিকে চেয়ে হাসলেন—ও সব আর্টিকল-ফার্টিকল যাদের ঘরে যাবে, তাদের খরচায় পড়ুক গে। আমাদের ক্ষমতায় কুলোবে না।

তোমার কাছে চাইছি নাকি? আমার পড়ার খরচা ছোড়দা আলাদা ভাবে দেবে

মালতী বললেন, আলাদা ভাবে মানে?

মানে, মাইনে থেকে নয়, রয়্যালটি থেকে।

"সে আবার কী?" কথাটা নতুন শুনলেন মালতী।

গল্প-টল্প লিখে যা পায়।

মালতী এবার জোরে হেসে উঠলেন—ও, তার নাম বুঝি রয়্যালটি? কত টাকা জান?

স্বামীর দিকে ফিরলেন।

কত ?

কাগজ বুঝে। কেউ দেয় দশ, কেউ আবার কিছুই দেয় না। তাই না ?—স্বয়ং লেখকের কাছেই সমর্থন চাইলেন। সুনীত হাসি-মুখে চুপ করে রইল। সুহৃদ বললেন, টাকা যা-ই হোক, নাম তো রয়্যালটি—রাজকীয় ব্যাপার। আসলে ওটা লেখার দাম নয়, লেখকের দক্ষিণা। যা-ই হোক, ও দিয়ে শিখারাণীর পাউডার-টাউডারগুলোর ব্যবস্থা হতে পারে, তার বেশী—

শিখা প্রথমে একটু অপ্রস্তুতে পড়েছিল, কিন্তু দমে যাবার পাত্রী সে নয়। বাবার কথা শেষ না হতেই বলে উঠল, বাকী টিউশনী করে চালাবে। ওর সঙ্গে আমার প্যাক্ট হয়ে গেছে।

প্যাক্ট !

হ্যাঁ, আমি ওর লেখা-টেখাগুলো কপি করে দেবো।

ব্যস্ ? মজুরিটা তুমি যেন বড্ড বেশী চাইছ, মা-মণি।

মোটেই না। ওর হাতের লেখা দেখেছ ? কে বলবে বাংলা অক্ষর ? একেবারে ফার্সী। দুলাইন পড়তেই মাথা ধরে যায়। তার ওপরে—

পিছন থেকে ঝুলন্ত বেণীতে টান পড়তেই ধমকে উঠল, কী হচ্ছে, ছোড়দা ?

আচ্ছা, তোরা এখন যা দেখি, বলে মালতী এগিয়ে এসে স্বামীর সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসলেন। উদ্বেগের সুরে বললেন, ব্যথাটা কেমন আছে ?

এখন আর টের পাচ্ছি না। একবার ঘুরে এলো হতো। একটা নতুন অর্ডার আসবার কথা ছিল।

না ; আজ আর গিয়ে কাজ নেই। একদিনের মতো নিশিবাবুই সামলে নিতে পারবে। খুকুর বিয়ের চেষ্টা এখন থেকেই শুরু করা দরকার। বন্ধু-বান্ধবদের বলে রাখো।

সিঁড়ির মুখে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল। নিচের গলি থেকে কেউ সুইচ টিপেছে। মালতী ঝি-এর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, ছাখতো কে ?

কথা হচ্ছিল বসবার ঘরে। বাইরের কেউ হলে এইখানেই আসবে। সুতরাং মালতীকে উঠে পড়তে হলো। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে দেখলেন, বেশ খানিকটা লম্বা ছিপছিপে গড়নের একটি শ্যামবর্ণ ছেলে বিনীত ভঙ্গিতে ঝি-এর পিছন-পিছন বাইরের ঘরের দিকে চলে গেল। মুখের ডৌলটা, যেটুকু দেখা গেল, বেশ মিষ্টি। পরক্ষণেই স্বামীর উচ্চ কণ্ঠের সাদর অভ্যর্থনা কানে গেল, আরে নিলয় যে। এস, এস।···বলতে বলতে বাইরে এসে হাঁক দিলেন, কই কোথায় গেলে ? ছাখো কে এসেছে।

মালতী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। ছেলেটি সলজ্জ নত মুখে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তিনি তার চিবুক স্পর্শ করে আঙুল ক'টি ওষ্ঠে ঠেকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, তুমি নিলয়। ···বলে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তার মধ্যে হয়তো কিছুটা বেদনার স্পর্শ জড়িয়েছিল। ঐ মুখের পাশে আর একখানা মুখ তাঁর চোখের উপর ভেসে উঠেছিল। ওরা এক সঙ্গেই থাকে।

॥ আট ॥

নিলয় তারপর অনেকবার এসেছে। প্রথম দিকে অনির্দিষ্ট ব্যবধানে, তারপর প্রায় নিয়মিত—কখনো সপ্তাহান্তে, কখনো বা মাঝখানে একটা সপ্তাহ বাদ দিয়ে। আগেকার দিনে সুবীর যেমন আসত। বন্ধুর সম্বন্ধে 'চৌকস' বিশেষণটা মিসেস দত্তের কাছে সুবীর হয়তো না-ভেবে-চিন্তে অনেকটা মুখে-এসে-গেল হিসাবে ব্যবহার করে থাকবে। কিন্তু কথাটা যে যথাযথ, তার প্রমাণ সুবীর আর কত পেয়েছে? সুতপার ভাষায় বন্ধুর 'গার্জেনগিরি' তাকে বেশীদিন করতে হয়নি। সে-প্রমাণ পাওয়া গেল এখানে—নিউ সাউথ পার্কের বাড়িতে। 'এ ছেলেটি এসে বাড়ির বড় ছেলের অভাব পূরণ করল' —ভাড়াটেদের প্রসঙ্গে স্ত্রীর কাছে মন্তব্য করেছিলেন বিশ্বনাথবাবু। স্বামীর খুব কম কথাই সরকার গৃহিণীর সমর্থন লাভ করত। এখানে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে যোগ করেছিলেন, 'তার চেয়েও বেশী।' শেষের উক্তিটাই আরো সত্য। নিলয়ের আসনটা কোনদিকে বেশী বিস্তৃত—রুদ্র পরিবারের যেটা অন্তরের দিক, যেখানে সে চারটি বিভিন্ন প্রকৃতির প্রাণীর সঙ্গে বিভিন্ন বন্ধনে জড়িত, সেখানে? না, যেটা তার বাইরের দিক, যেখানে সংসার তার ছোট বড় নানা সমস্যার সমাধান চাইছে, সেইখানে? এ প্রশ্ন কারো মনে আসেনি। এলে তার উত্তর দেওয়া কঠিন ছিল।

মালতী হয়তো একটা কিসে আটকে গিয়ে বললেন, 'ওটা থাক, আসছে রোববারে নিলয় এসে করবে।'

সুহৃদ কি একটা ভাবতে ভাবতে রেখে দিয়ে বললেন, নিলয় আসুক, ওর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখি।

সুনীত অধীর হয়ে বলে উঠল, নাঃ, নিলয়দাকে নিয়ে আর পারা

গেল না। এত করে বললাম, আমার ভীষণ দরকার, যাবার সময় দেখা করে যাবেন। কোন ফাঁকে যে চলে গেল!

শিখা এসে ঠোঁট ওল্টালো মায়ের কাছে, তোমাদের নিলয়বাবু বুঝি নিউ সাউথ পার্কের পথটা একেবারে ভুলে গেলেন?

এ বাড়িতে এই হলো নিলয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

একদিন তার ছেলেবেলাকার গল্প শুনতে শুনতে মালতী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, এ রকম কোথাও দেখা যায় না। মাথার ওপর কেউ-না-কেউ থাকেন। তোমার যে একেবারে শূন্য।

সে কি বলছেন মাসিমা! অত বড় সি-ঈ আছেন কী করতে? তার ওপরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তারও ওপরে—

আহা, ওদের কথা কে বলছে? বাপ-মা ভাই-বোন—এদের কথা বলছি।

নিলয়ের সুরে হঠাৎ গভীরতার স্পর্শ লাগল—এতদিন যা-ই থাকি না কেন, এখন তো আর সেদিক দিয়ে নিজেকে বঞ্চিত বলতে পারি না।

পরক্ষণেই আবার হাল্কা সুরে বলল, মাথার ওপর না থাকুন ঘাড়ের ওপর যারা আছেন, তাদের দলটি নেহাৎ ছোট নয়।

তারা আবার কারা?

কেন, আমার স্নেহময় কাকারা, কাকীরা, সঙ্গে বেশ কিছু এবং।

শিখা ছিল মায়ের পাশে। তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, আপনি বলে এখনো তাদের টানছেন। আমি হলে ওরকম কাকা-কাকীর মুখও দেখতাম না।

সে তো আমিও দেখি না। তাঁরাও আমার মুখ দেখবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নন। তবে মাসের গোড়াতে একজনের মুখ না দেখতে পেলে মুষড়ে পড়েন।

—সে আবার কে?

মনি-অর্ডার পিওন।

বলে, হেসে ফেলল নিলয়। তার বলবার ধরণে মালতীও না হেসে পারলেন না। শিখা রাগ করে উঠে চলে গেল। নিলয়ের কাকাদের কীর্তি-কাহিনী মার মুখে যেটুকু শুনেছে, তারপর তাদেরই জন্যে ওর এই দরদ বা কর্তব্য যাই বলুক, সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ক্ষমতা থাকলে এই অত্যাচার সে এখনই বন্ধ করে দিত।

শিখা এখন আর সে ছেলেমানুষটি নেই। সকলের চোখের আড়ালে সহসা কখন বড় হয়ে গেছে। সুগঠিত দেহের কানায় কানায় পূর্ণতার আভাস। দু'চোখে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে একটি প্রদীপ্ত শিখার মত যখন সে ঝড়ের বেগে ঘরে গিয়ে ঢুকল, নিলয় কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইল। অনুরাগ নারীকে একটি বিশেষ সৌন্দর্য দান করে, একথা সে শুনেছে। রাগও যে কত সুন্দর, আজ নিজের চোখে দেখল।

নিলয় সুবীরের সহকর্মী এবং বন্ধু, ঘটনাচক্রে হঠাৎ দেখা হবার পর সুবীরের বাবা তাকে একদিন আসবার অনুরোধ জানিয়ে এসেছিলেন, কেবল মাত্র এই কারণেই রুদ্র-পরিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছিল, একথা বলা চলে না। তার পিছনে আর একটি ইতিহাস আছে। সেটা একটু বিশদভাবে বলা প্রয়োজন।

সুতপা কোয়ার্টার্সে এসে উঠবার পরেও তাকে কিছুদিন বন্ধু-দম্পতির সঙ্গে কাটিয়ে আসতে হয়েছিল। দুজনেই সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি। একটু গোছগাছ করে না বসা পর্যন্ত তারা ওকে ছাড়েনি। সুতপা চেয়েছিল, সে ওখানেই থেকে যাক। নিলয় তাতে রাজী নয় দেখে বলেছিল, আমি আসতেই বুঝি আপনাদের বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটল?

"তাই তো নিয়ম," বলে, মহাকবি কালিদাসের নজিরও দেখিয়েছিল নিলয়, "আপনি তো এই ব্যক্তিটির শুধু গৃহিণী এবং সচিব নন, প্রিয় সখীও বটে।'

বেশ তো ; তাই বলে তার কি একটি প্রিয়সখা থাকতে নেই ?

সেটা বাহুল্য মাত্র।

'বি-টাইপে' উঠে যাবার পর নিলয় মাঝে মাঝে দু একটা সন্ধ্যা এবং রবিবারের সকাল কাটিয়ে আসত ও-বাড়িতে। প্রায় দিনই মিসেস দত্তের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। তিনি কন্যা-জামাতার তদারক করতে আসতেন, বেশীক্ষণ বসতেন না। যেটুকু থাকতেন, তাতেই প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিতেন, নিলয়ের এই আসা-যাওয়াটা তিনি বিশেষ সুনজরে দেখছেন না।

তার কারণ অবশ্যই ছিল। সুবীর চাকরির দিক দিয়ে তার সমস্তরের হলেও জামাতা হিসাবে বহু উর্ধ্বে। সেই পদে যাঁরা তাকে বসিয়েছেন, তার উচ্চতা রক্ষার দিকে তাঁদের নজর না দিলে চলে না। 'জামাতার' শ্বশুর হয়তো এ সব নিয়ে মাথা ঘামান না, কিন্তু শ্বশ্রূ অতিশয় সজাগ। বেচারা সুবীর নিরুপায়। তাকে বিপন্ন করে কী লাভ? সুতরাং নিলয়কে নিজে থেকেই সরে আসতে হল।

তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। সি. ঈ. সাহেবের কন্যা-জামাতা, বলা-নেই কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন তার 'বি টাইপে' এসে হাজির! নিলয় ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ল। না আছে সোফা-টোফা, না আছে কিছু। বাইরের ঘর একটি আছে বটে, তার শোভা বর্ধন করছে একখাতা নিরালা তক্তপোষ। তার লজ্জা নিবারণ করবার জন্যে যে চাদরের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, সেটিও অনেকদিন হল রজক-দর্শনে বঞ্চিত। ভিতরে যে আরেকটি কামরা আছে, তার অবস্থাও সভ্য সমাজে মুখ দেখাবার মত নয়। ঝাড়নের অভাবে একটা পায়জামা টেনে নিয়ে তাকে যখন নিজে হাতে ভদ্রস্থ করবার আয়োজন করছে, সুতপা বলে উঠল, খুব হয়েছে, দয়া করে এবার বাইরে গিয়ে বসুন তো।

নিলয় বেঁচে গেল।

তারপর তার অদ্বিতীয় অনুচরটিকে ডেকে, ধমকে, কোথায় কেটলি, কোথায় প্যান, কোথায় স্টোভ ইত্যাদি সংগ্রহ করে চা এবং কিছু খাবার করে ফেলল সুতপা, দু-বন্ধুকে খাওয়াল, নিজেও খেল এবং কিছুক্ষণ হৈ চৈ করে, যাবার সময় বলল, অন্যের সংসার তো বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতে পারেন, নিজের এ হাল কেন ?

নিলয় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, কারণ অতি সোজা। যেখানে যেটা মানায়।

বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর এই আকস্মিক অভিযানের প্রেরণা যে দ্বিতীয় ব্যক্তির, প্রথম জন শুধু নীরব সঙ্গী, এটুকু সহজেই বোঝা গিয়েছিল, কিন্তু সেই প্রেরণার উৎসটা কোথায়, নিলয় তৎক্ষণাৎ ধরতে পারেনি। দু'-একদিনের মধ্যেই পারল।

সেটা আর কিছুই নয়, মায়ের আচরণে কন্যার নীরব প্রতিবাদ। প্রতিবাদের পিছনে যে-সব জটিল কারণ ছিল, তাও তার কাছে অস্পষ্ট রইল না।

মেয়েদের মধ্যে দুটো দল আছে। এক, যারা বিয়ের পরেও মায়ের মেয়েই থেকে যায়, যাদের জীবনে পত্নীত্বটা অপ্রধান, ইংরেজিতে যাকে বলে সেকেণ্ডারী। দুই, যারা বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর স্ত্রী, অর্থাৎ সেইটাই মুখ্য, মায়ের স্থান সেখানে স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সুতপা এই দ্বিতীয় দলভুক্ত। মিসেস দত্ত অত বুদ্ধিমতী হয়েও মেয়ের চরিত্রের এই দিকটা বুঝতে পারেননি, কিংবা পারলেও, একমাত্র কন্যার উপর এতদিন যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করে এসেছেন, তারই দিকে চেয়ে সেটা তৎক্ষণাৎ গুটিয়ে আনতে পারেননি। তাঁর স্বভাবের মধ্যেও একটা প্রভুত্ব বিস্তারের আকাঙ্খা আছে, স্বামীর প্রশ্রয় পেয়ে যা ক্রমশ প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুতপা যদি বিয়ের পর শ্বশুর ঘর করতে চলে যেত, বেশির ভাগ মেয়ে যেমন যায়, মিসেস দত্ত আপনা থেকেই নিজেকে অনেকখানি

সরিয়ে না এনে পারতেন না। কিন্তু সে তাঁর ঘরের পাশেই রয়ে গেল। শুধু তাই নয়, শ্বশুর-ঘর বলে কোনো বস্তু সে পেলই না, (তার জন্যেও প্রধাণতঃ দায়ী মিসেস দত্তের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রবণতা) ভবিষ্যতে যে পাবে তেমন সম্ভাবনাও দেখা গেল না। সুতরাং বিয়ের আগে মেয়ের জীবনে তিনি যে জায়গা জুড়ে ছিলেন, বিয়ের পরেও সেইখানেই রয়ে গেলেন। কিংবা, বলা যেতে পারে, তাঁর স্থান আরো কিছুটা বিস্তৃত হলো। মায়ের সঙ্গে আবার শাশুড়ীর দায়িত্ব এসে জুটল।

ঘটনা-চক্রের এই যে বিবর্তন, তার মধ্যে সুবীরের স্থানও কম নয়। তার মেরুদণ্ডটিকে যদি আর একটু শক্ত করে গড়তেন তার বিধাতা পুরুষ, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা শুরু থেকেই অন্য রূপ নিত। নেয়নি, তার প্রধান কারণ, বিয়ের অনেক আগে থেকে তার ভাবী শ্বশ্রূ তার উপরে এমন একটি মোহজাল বিস্তার করেছিলেন, যাকে ইন্দ্রজাল বললে অত্যুক্তি হয় না। কেমন করে কখন যে সে এই মহিলাটির হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সুবীর জানতে পারেনি। তারপর থেকে প্রতি পদক্ষেপে তিনিই তাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। নিজস্ব মতামত বলে তার কিছুই ছিল না। থাকলেও সেটা প্রকাশ করবার মতো সাহস ছিল না। বিয়ের প্রস্তাবটাকে চূড়ান্ত রূপ দেবার আগে একদিন কোনো রকমে বলে ফেলেছিল, বাড়িতে এখনো কিছু বলিনি। আপনাদের কাছ থেকে চিঠি যাবার আগে আমি বরং—

এই পর্যন্ত শুনেই বিস্ময়ে যেন থ হয়ে গিয়েছিলেন মিসেস দত্ত, সে কি! তুমি না বলেছ বাবা-মা তোমাকে কোনো কাজে বাধা দেন না, তোমার ওপর তাঁদের অখণ্ড বিশ্বাস? তাই যদি হয়, এত বড় একটা ব্যাপারে অমত করবেন, এ রকম আশঙ্কা করছ কেন?

সুবীরের মুখে এর পরে আর কোনো কথা যোগায়নি। আসলে আশঙ্কা ছিল মিসেস্ দত্তের নিজের মনে। ভাবী জামাতাটিকে তিনি

বিলক্ষণ চিনতে পেরেছিলেন। তাই, সব কিছু মিটে যাবার আগে তাকে কাছ ছাড়া করতে চাননি। নিউ সাউথ পার্কের আওতায় গিয়ে পড়লে এই নরম শিরদাঁড়াটা কোন্ দিকে বেঁকে যাবে কে জানে?

বিয়েটা চুকে যাবার পর নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন মিসেস্ দত্ত। জামাতাটি যখন তার সম্পূর্ণ করায়ত্ত, মেয়ের সংসারে তার প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রইল, সে বিষয়ে তার শ্বশুর-বাড়ির দিক থেকে যে কোনো বাধা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকল না, এতেও তিনি মনে মনে খুশী হয়েছিলেন। স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারেননি, সে বাধা আসবে এমন একটা কোণ থেকে যেখানে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব জন্মসূত্রেই কায়েম হয়ে আছে।

কিন্তু অন্ধকার ছিল প্রদীপের ঠিক নিচেই; নিজের মেয়েকেই তিনি চিনতে পারেননি।

সুতপাকে তার নির্দিষ্ট বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে প্রত্যহ একবার করে তাদের দেখে যেতেন মিসেস দত্ত। কোনো কোনো দিন দুবারও আসতেন—এবেলা ওবেলা। একমাত্র কন্যা ও জামাতার প্রতি এই প্রবল টান সম্পর্কে বলবার কিছু নেই, কিন্তু তার আতিশয্যটা মেয়ে বিশেষ সুনজরে দেখত না।

মেয়ে-জামাই কখন কোথায় যাবে, কার সঙ্গে মিশবে, এ সবও তিনি স্থির করতেন। সুতপার অসন্তোষ বাড়তে লাগল, কিন্তু মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারল না। সুবীরের তরফ থেকে সামান্য আপত্তি এলেও সে জোর পেত। তা এলো না। তারপর যেদিন তিনি, নিলয় কেন এখনো এখানে পড়ে আছে, এই নিয়ে একটু রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করলেন, তখন আর সে চুপ করে থাকতে পারল না। স্বামীর কাছে গিয়ে বলল, নিলয়বাবু চলে যাবেন কেন? আমাদের তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

সুবীরেরও মনোগত ইচ্ছা, সে থেকে যাক,. কিন্তু শাশুড়ীর ইচ্ছাও সে জানে, তাঁর সরব আপত্তিও তার কানে এসেছে। তাই

উভয় কূল বজায় রেখে বলল, তাতো ঠিকই, কিন্তু আমি বললে কি ও থাকবে? তার চেয়ে তুমি বললে ভালো হয়।

সুতপা জানত, নিলয় সুবীরের কোনো আত্মীয় নয়, বন্ধু। অতটা ঘনিষ্ঠ না হলেও তার আরো বন্ধু ছিল। তবু কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে একে তার স্বামীর পিতৃকুলের একজন বলে মনে হতো। যে শ্বশুর-ভাশুর-দেওরকে সে পেলো না, এ যেন তাঁদেরই প্রতিনিধি। তাছাড়া এ রকম দরদী শুভাকাঙ্খী তাদের আর নেই। এ তাদের সঙ্গেই থাকবে। এই মনোভাব থেকেই তাকে রাখতে চেষ্টা করেছিল। সে চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, তখন এই অনুরোধ করেছিল, সে যেন আপন জনের অধিকার নিয়ে এ বাড়িতে আসে যায়। তাই আসছিল নিলয়। সেটাও মায়ের মনঃপূত হল না, এবং তাঁর এই মনোভাবটা নিলয়ের কাছেও তিনি অস্পষ্ট রাখতে চাইলেন না। এর পরে আর সে আসে কেমন করে?

সুতপা ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠতে লাগল। তার নিজের সংসারে তার এতটুকু স্বাধীনতা নেই? তার স্বামীর বন্ধু, যাকে তারা তুজনেই চায়, তাদের কাছে আসতে পারবে না, এলে অন্যের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যাবে—এত বড় অত্যাচার কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

একদিন সুবীর আফিস থেকে ফিরবার কিছু পরেই পরনের শাড়িটা শুধু পালটে নিয়ে সোজা গিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি জামা পরে নাও। বেরোতে হবে।

কোথায়!

কাছেই। চল, নিলয়বাবুকে দেখে আসি।

কী হল তার! এই আধঘণ্টা আগেও তো—

কিছু না হলে বুঝি কারো বাড়ি যেতে নেই? উনি এতবার এসেছেন, আমাদের অন্তত একবারও তো যাওয়া উচিত।

সুবীর ভিতরকার ব্যাপারটা জানে। বোধহয় সারাদিনের

খাটুনি কিংবা ঐ জাতীয় একটা কোন অজুহাত দেখাতে যাচ্ছিল। সে সময় আর পেল না। সুতপা একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে গেল এবং চায়ের ব্যবস্থা করল ওখানে গিয়ে।

উলুখড় বেচারার বিপদ সর্বত্র। যুদ্ধ করেন রাজারা এদিকে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। মাতা-পুত্রীর এই 'ঠাণ্ডা লড়াই' এর জের গিয়ে পড়ল নিলয়ের উপর। মিসেস দত্ত তার উপরে প্রসন্ন ছিলেন না, এবার রুষ্ট হলেন। সে রোষ সি, ঈ, র, মধ্যেও সঞ্চারিত করে ছাড়লেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়র নিলয় মিত্রের কাজ-কর্মে মাঝে মাঝে দোষ-ত্রুটি আবিষ্কৃত হতে লাগল। সহকর্মিমহলও তাকে নায়ক করে মুখে মুখে একটি ছোটাখাটো নাটক জমিয়ে তুলল। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। নাটকীয় উপাদানের অভাব ছিল না। চীফ এঞ্জিনিয়ারের অনুগ্রহে তাঁর ভাবী জামাতার সঙ্গে এ 'টাইপ' কোয়ার্টাসে প্রমোশন; কিছুদিন পরেই মিসেস সি, ঈ, কর্তৃক সেখান থেকে বহিষ্কার; তা সত্ত্বেও উপর মহলে ঘনঘন আনাগোনা; সি, ঈ, কন্যার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ; শেষ পর্যন্ত পুনর্মূষিক—রীতিমত জমাট নাটক, এবং তার মধ্যে 'ফান' বা মজার অন্ত নেই।

সমবৃত্তির একদল লোক নিয়ে যখন একটা বসতি গড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে সদ্ভাব এবং সম্প্রীতির বন্ধনও গড়ে উঠবে, এ আশা যারা করেন, তারা বড় বেশী আশাবাদী। উল্টোটাই বরং দেখা যায়। মৌখিক সৌহার্দ্যের একটা প্রলেপ হয় তো রাখতে হয়, তার আড়ালে থাকে হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা, কলহ এবং কে কাকে কেমন করে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, তারই ষড়যন্ত্র। ব্ল্যাকউড অ্যাণ্ড সন্‌স্ কোম্পানীর কলোনীতেও তার অভাব ছিল না। সুতরাং নিলয় বিস্মিত হয়নি। তাকে নিয়ে মজাটা যারা বেশী উপভোগ করছে, তাদের কেউ কেউ তার কাছে নানাভাবে উপকৃত, এতেও সে তেমন কিছু আশ্চর্য বোধ করল না। কিন্তু নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো,

আর সুতপার জন্যেও একটা সমবেদনা অনুভব করতে লাগল। তার এই লাঞ্ছনার জন্যে নিজেকে খানিকটা দায়ী না করে পারল না। সুবীর বেচারাও এসব নিয়ে প্রচুর অশান্তি ভোগ করছে। অথচ কোনো দিক দিয়ে তার কিছু করবার নেই।

দিন কয়েক বেহালাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল। তাতেও মন বসাতে পারল না। আপনজন বলতে কেউ নেই, যাদের কাছে গিয়ে দুটো দিন কাটিয়ে আসা যায়। হঠাৎ মনে পড়ল, সুবীরের বাবা তো তাকে বারবার করে যেতে বলে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই স্নেহ-গভীর আন্তরিকতার সুরটি কানে লেগে আছে। সুবীরের মায়ের কথাও অনেক শুনেছে তার মুখে। একবার ঘুরে এলে কেমন হয়?

দুদিন পরেই ছিল রবিবার। সকালে উঠেই ছোট্ট সুটকেসে নিত্য প্রয়োজনের টুকিটাকি জিনিস ক'টা ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিউ সাউথ পার্কের উদ্দেশে।

পরের কথা আগেই বলা হয়েছে।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে নিলয় এই নিউসাউথ পার্কের বাড়িতে যে স্থানটিতে এসে দাঁড়াল, সেটা যে অনেকাংশে তার স্বোপার্জিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবু সুবীরের বন্ধু হিসাবেই এখানে তার প্রথম পরিচয় এবং সেই পরিচয়েই সে এঁদের কাছে এসে উঠেছিল। তার আগে থেকেই এই পরিবারে তার জন্যে একটি অনুকূল আবহাওয়া তৈরী হয়ে ছিল। তার মূলেও সুবীর। বাপ-মা ভাই-বোনের কাছে তার শিক্ষানবিসি জীবনযাত্রার কোনো প্রসঙ্গ যখনই উঠত, নিলয়ের কথা প্রায়ই বাদ পড়ত না। বলত, নিলয় শুধু আমার ফ্রেণ্ড নয়, ফ্রেণ্ড্, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড্।

এই স্বজনহীন ছেলেটির উপর মালতীর মনে একটি সাগ্রহ মমতার সৃষ্টি হয়েছিল। বারবার বলেছেন, ওকে একবার আনতে

পারিস না? সুবীর বলত, সে চেষ্টা কি করিনি, মনে কর? কিন্তু সে কোথাও যায় না। ভীষণ মুখচোরা।

নিলয়ের সঙ্গে সুহৃদের যেদিন প্রথম দেখা, তিনি তার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্টেশনে বাড়িতে আসবার অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থায় এই ছেলেটির সহৃদয় মধুর অন্তরঙ্গ ব্যবহার সুহৃদকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এর উপর তাঁর সুগভীর এবং সস্নেহ আকর্ষণের প্রধান কারণ—সে সুবীরের অকৃত্রিম বন্ধু। ছেলের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে তিনি যেন অজ্ঞাতসারে তার এই একান্ত সুহৃদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

নিলয় প্রথম দিন এসেই রুদ্র পরিবারের মনটিকে বুঝতে পেরেছিল। বুঝেছিল, এবাড়ির প্রথম সন্তান এবং প্রধান নির্ভর এখানে একটি গভীর শূন্য রেখে গেছে, কিন্তু কেউ সেই নির্মম সত্যটি স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। কারো মুখে তার কোনো উল্লেখ নেই, যেন সুবীর বলে এদের একজন কেউ ছিল, এখনো আছে, সে কথা এরা জানেনা। তার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দূরে থাক, সামান্য কৌতূহলও কারো কথায় প্রকাশ পায় না। একটা প্রচণ্ড অভিমান সমস্ত পরিবারের কণ্ঠ রোধ করে রেখেছে।

কিন্তু প্রকৃতি যেমন শূন্য সহ্য করে না, যেখান থেকে যেমন করে পারে তাকে পূর্ণ করে দেওয়াই তার ধর্ম, মানব প্রকৃতিও তাই। মানুষের মন 'নেই' কে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে পারে না, চেষ্টা করলেও না। একজন যে ফাঁক রেখে গেল, নিজের অজান্তে আর একজনকে দিয়ে সেটা ভরে তোলে। নিলয় বুঝতে পারছিল, তার বেলায় ঠিক তাই ঘটছে। দিনের পর দিন সে তার বন্ধুর শূন্য স্থান পূরণ করে চলেছে। হয়তো সেটাই তার একমাত্র ভূমিকা নয়। এঁদের কাছে তার একটা নিজস্ব স্থানও আছে এবং দিন দিন সেটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। তবু মূলতঃ সে সুবীরের বিকল্প।

মাঝে মাঝে মনে হত এ বাড়ির জ্যেষ্ঠপুত্র যে এখান থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে, তার জন্ত সে-ই দায়ী। সে এসে যেন সুবীরের জায়গাটা দখল করে নিয়েছে। আর নয়; এবার নিঃশব্দে সরে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই সেটা তার নিজের দিক থেকে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরই মধ্যে সে এখানকার প্রতিটি মানুষের সঙ্গে নানা বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছে। তবু সে বন্ধন-পাশ সে ছিন্ন করে চলে যেতে পারত, তার জন্যে যত বেদনাই লাগুক। কিন্তু সে সরে গেলেই কি সুবীরের ফিরে আসবার পথ সুগম হবে? যে ভুলের প্রাচীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা ভেঙে পড়বে? উভয় দিকের বিমুখ-মন উন্মুখ হয়ে উঠবে? সে সম্বন্ধে নিলয় কোনো ভরসাই দেখতে পাচ্ছিল না।

তার চেয়ে বরং আর একটা কাজ সে করতে পারে। যে সূত্রটি ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া লাগাবার চেষ্টা করতে পারে। এতদিন সেটা ছিল অতিমাত্রায় দুরূহ। তাজা ক্ষতের উপর মানুষের হাত সইত না। কিন্তু কালের প্রলেপ যখন তাকে আপনা থেকেই উপশমের পথে এগিয়ে নিয়ে এসেছে, তখন হয়তো সে ব্যর্থ হবেনা। কেবলমাত্র সুবীর এবং তার বাবা-মা ভাই-বোনের দিকে চেয়েই যে একাজ তাকে করতে হবে, তাই নয়, এর পিছনে তার নিজের গরজও কম নয়। শুরু থেকে যে অপরাধবোধ যখন তখন তার মনের মধ্যে খচ্‌মচ্‌ করে বিঁধছে, তার থেকেও সে মুক্ত হতে পারে।

সুবীরের বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিলয়ের কোনো হাত ছিলনা। চীফ এঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে সে যায় আসে, মিসেস্‌ দত্ত তাকে একটু বিশেষ স্নেহ দৃষ্টিতে দেখেন—অন্যান্য অ্যাপ্রেন্টিস্‌দের তুলনায়—এটুকু সে জানত, কিন্তু তাঁর কন্যার সঙ্গে বন্ধুর বিশেষ সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারেনি। ওখানে তার কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে, সেটা আঁচ করতে পেরেছিল, তার উপরে কোনো গুরুত্ব

আরোপ করেনি। সুবীরও এ বিষয়ে মাঝে মাঝে হালকা ধরনের উল্লেখ ছাড়া আর কিছু খুলে বলেনি। হয় সে নিজের মনকে বুঝতে পারেনি, কিংবা এই একান্ত নিজস্ব অনুভূতিটুকু বন্ধুর কাছে চেপে রেখেছিল।

নিলয়ের দৃষ্টি সংসারের অন্য সব দিকে যতই তীক্ষ্ণ হোক, এই প্রেমঘটিত ব্যাপারে রীতিমত ঝাপসা। তাছাড়া নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় সজাগ ছিল বলে ঐ জগৎটা বরাবর এড়িয়ে চলত। তার বেহালার সূত্র ধরে এখানকার নানা অনুষ্ঠানে এবং পার্টি পিকনিক ইত্যাদি সমাবেশেও তার ডাক পড়ত। পারত পক্ষে যেতনা; গেলেও নিজের নির্ধারিত কাজটুকু সেরে চলে আসত।

সুতরাং প্রিয়বন্ধুর আর সব ক্রিয়া-কলাপ, চিন্তাধারা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকলেও, পঞ্চশরের এলাকাভুক্ত অংশটুকু নিলয়ের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে গিয়েছিল। কেউ কেউ অবশ্য নানা কথা তার কানে তুলেছিল, সেগুলোকে সে আমল দেয়নি। কোনো খোঁজখবর পর্যন্ত নেয়নি। সুবীর সম্পর্কে তার এই অমনোযোগ, অবহেলা, অথবা নিষ্ক্রিয়তা—যে নামই দেওয়া যাক—নিলয় শুধু ত্রুটি হিসাবে দেখেনি, অপরাধ বলে মনে করেছিল। বন্ধুর মনোবল তার অজানা ছিল না। তার শিরদাঁড়াটি যে বড় বেশী নমনীয়, তাও জানত। ওদিকে মিসেস্ দত্ত নামক মহিলাটির যে সামান্য পরিচয় পেয়েছিল, তার থেকে বোঝা উচিত ছিল, তিনি বিনা স্বার্থে, বিনা উদ্দেশ্যে এই ছেলেটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেননি। এত সব জেনেও সে কেমন করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিল, নিলয় ভেবে পায়না। এই তার বন্ধুপ্রীতির নমুনা।

চীফ্ এঞ্জিনিয়ারের জামাতার পদ গ্রহণ যে অবাঞ্ছনীয়, এরকম কোনো গোঁড়ামি নিলয়ের মধ্যে ছিলনা। কন্যাটি দেখতে মন্দ নয়, ওখানকার কোনো কোনো পদস্থ অফিসারের বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাদের নিয়ে তার সহকর্মি-মহলে যেসব চটুল আলোচনা হত, তার মধ্যে

সুতপার নাম তার কানে আসেনি। বধূ-নির্বাচনের দিক থেকে সুবীর কোনো ভুল বা অন্যায় করেছে বলে নিলয়ের মনে হয়নি। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে শুভকার্যটি সম্পন্ন হল, সেইখানেই আপত্তি। সব কিছু স্থির হয়ে গেল, অথচ সুবীর বাবা-মার সম্মতি নেওয়া দূরে থাক, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করলনা, এমনকি তাকে পর্যন্ত জানাল না, এটাই অত্যন্ত বিস্ময়কর। নিলয় পরে জেনেছিল, কেন সেটা করেনি, অর্থাৎ করে উঠতে পারেনি। অন্যের পক্ষে যেটা ছিল সহজ ও স্বাভাবিক, সুবীরের কাছে সেটাই কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইখানেই নিলয় তাকে সাহায্য করতে পারত, যদি ঘটনার গতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগে তার দৃষ্টিগোচর হত। তার জন্যে সুবীর যতটা দোষী, নিলয়ের দোষ তার চেয়ে কম নয়।

সুবীরের মা-বাবা ভাই-বোনের সঙ্গে মিশবার পর সে আরো বুঝতে পেরেছিল, তাদের তরফ থেকে কোনো বাধা আসত না। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাত দিতে পারলে, এতবড় একটা মর্মান্তিক পরিণতি অতি সহজে এড়ানো যেত। সেই সুযোগ সে হেলায় হারিয়েছে। তার জন্যে নিলয়ের মনে ক্ষোভ এবং আফসোসের অন্ত ছিল না।

আজ সুবীরের আপন জনেরা যখন তার শূন্য আসনে একটি অনাত্মীয় এবং প্রায় অপরিচিত আগন্তুককে সাদরে আহ্বান করে বসিয়ে দিল, তার অন্তর্নিহিত বেদনাটুকু উপলব্ধি করে নিলয়ের একমাত্র চেষ্টা হল, বন্ধুর সেই জায়গাটি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু এখন আর সেটা সহজ নয়। তার জন্যে একটি অনুকূল আবহাওয়ার প্রয়োজন। যখন-তখন যেমন-তেমন করে কথাটা পাড়লেই হবেনা। আঘাত যে কত গভীর একটি মাত্র লক্ষণেই সেটা সুস্পষ্ট। এঁদের কারো মুখে সুবীরের নাম পর্যন্ত নেই, অথচ তার বন্ধু বলেই এখানে তার যাতায়াত, এবং এখনো তারা একই

জায়গায় থাকে, একই কারখানায় কাজ করে। নিলয় অপেক্ষা করছিল সেই শুভ মুহূর্তের, যখন মালতী কিংবা সুহৃদের কাছ থেকে এমন কিছু পাবে, কোনো আভাস বা ইঙ্গিত, যার সুযোগ নিয়ে সে এই বেদনাময় অধ্যায়টা খুলে ধরতে পারে।

সেই ক্ষণটিই বোধ হয় এল একদিন।

বিকেল বেলা। সুহৃদ তখনো ফ্যাকটরী থেকে ফেরেননি, সুনীত শিখাও বাড়ি ছিলনা। শুধু নিলয় বসেছিল মালতীর ঘরে। হাতে চায়ের পেয়ালা, সামনে একটা টিপয়ের উপর টীপট্। তার থেকেই চা-টা ঢেলে নিলয়ের হাতে দিয়ে মালতী এইমাত্র খাটের উপর গিয়ে বসেছিলেন। তাঁর মুখের উপর একটি গভীর ম্লান ছায়া। সেটা লক্ষ্য করেই নিলয় চুপ করে ছিল। মাথা নিচু করে চামচে দিয়ে চিনিটা মিলিয়ে নিচ্ছিল। সেইদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মালতী হঠাৎ বললেন, ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়?

কার সঙ্গে, বলবার প্রয়োজন ছিলনা। নিলয় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তা হয় বৈ কি? একই তো আফিস।

আফিসে ছাড়া অন্য সময়? বেড়াতে-টেড়াতে যাওনা তোমরা?

নিলয়কে এবার সত্য গোপন করতে হল—যাই মাঝে মাঝে।

—কিছু বলে-টলে?

কোন্ বিষয়ে, প্রশ্ন করতে যাওয়া যেমন অর্থহীন, উত্তর দেওয়াও তেমনি কঠিন। নিলয় চুপ করে রইল। মনে করল সেই নীরবতার মধ্যেই তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে যাবেন মালতী। হয়তো তাই পেলেন, কিন্তু তাঁর সাগ্রহ চোখ দুটির দিকে চেয়ে নিলয় একেবারে নীরব থাকতে পারল না। অপরাধীর মত মাথা নত করে ধীরে ধীরে বলল, আপনি তো সবই বুঝতে পারেন মাসিমা। সে মুখ যদি থাকত—

এর বেশী আর কী বলবে নিলয়? মালতী অনেকটা যেন স্বগতোক্তির মত বললেন, একবার আসতেও তো পারত।

একটু থেমে নিলয়ের দিকে চোখ তুলে যোগ করলেন, তুমি বোধ হয় জানোনা, উনি তাকে বৌ নিয়ে আসতে লিখেছিলেন।

জানি মাসিমা, সে চিঠি আমি দেখেছি। অন্য কেউ হলে হয়তো ছুটে আসত। কিন্তু আপনার ছেলেকে তো আপনি জানেন।

—কী চায় সে?

—তা জানিনা। তবে এতদিন তাকে দেখে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশে যা বুঝেছি, সুবীর বোধ হয় আপনার কাছ থেকেও কিছু একটা—, সেটা যে চিঠি লিখেই জানাতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

অর্থাৎ সে নিজেই সেটা এই মুহূর্তে বয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত, নিলয়ের কথায় এবং ইঙ্গিতে সেটুকু অস্পষ্ট রইল না।

মালতী নত মুখে নীরবে বসে রইলেন। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ তুলে বললেন, তুমি কি আর একটু চা নেবে?

—দিন না?

নিলয়ের চা-এর কোনো প্রয়োজন ছিলনা। প্রয়োজন ছিল আর একটু সময় নেবার, ছিন্ন সূত্রের ধারটা আবার যদি তুলে নেন মালতী, এই আশায়। কিন্তু সে আশা অপূর্ণ রয়ে গেল।

টী-পটের ঢাকনা খুলে নিলয়ের পেয়ালাটা ভরে দিয়ে তিনি নিঃশব্দে উঠে গেলেন।

॥ নয় ॥

অন্যের ভালো করতে যাওয়ার মত মহৎ প্রচেষ্টা আর কী হতে পারে? সে 'অন্য' যদি নেহাৎ পর হয় কারো কারো মনে হয়তো সন্দেহ জাগতে পারে, পিছনে কোনো মতলব নেই তো? কিন্তু যার ভালো করতে যাচ্ছি সে যেখানে একান্ত আপন জন, সেখানে সে কথা উঠতে পারে না। তবু সেখানেও পরোপকার প্রবৃত্তির মুখে একটা বলগা থাকা দরকার। তা না হলে, উপকৃত ব্যক্তি যতই আপন হোক, একদিন সে মনে মনে বলবে, আর নয়, এবার আমার নিজের ভালো নিজেকেই করতে দাও।

সুতপার বারবার সেই কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু মিসেস দত্ত ওদিকে পণ করে বসেছেন, কন্যা-জামাতার কল্যাণই তার ধ্যান জ্ঞান, সাধনা, তার জন্যে তিনি করতে পারেন না, এমন কিছু নেই। ছুট করে নিলয়ের বাড়ি গিয়ে তাকে চা-খাবার করে খাওয়ানো যে কতখানি অন্যায় হয়েছে, সে সম্বন্ধে মেয়েকে সানুযোগ জ্ঞানদান করেই ক্ষান্ত হলেন না, ভবিষ্যতে তারা কার বাড়ি যাবে, আর কার বাড়ি যাবে না, তার একটা তালিকাও তৈরি করে দিলেন। মেয়ে গুম হয়ে রইল। আর কেউ হলে তার মুখ দেখেই বুঝতে পারত, সেখানে আর যাই হোক, মায়ের আদেশ-নির্দেশ নত শিরে মেনে নেবার কোনো লক্ষণ ফুটে ওঠেনি। কিন্তু দত্তজায়া বুঝলেন না, অথবা বুঝেও সে সব গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। তাঁর একটা মোক্ষম যুক্তি ছিল, তোরা ছেলে মানুষ, তোরা কী বুঝিস? আর বলতেন, তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছি?

একদিন সন্ধ্যাবেলা মেয়ের সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি স্বচক্ষে তদারক করে চাকর-বাকরদের যথারীতি ধমক-ধামক দিয়ে, ওদের দুজনের উপরেও কিছু মূল্যবান উপদেশ বর্ষণ করে সবে যখন

গাড়িতে গিয়ে উঠেছেন, সুতপা গম্ভীর মুখে স্বামীর ঘরে গিয়ে কোনো রকম ভূমিকা না করে বলে ফেলল, চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সুবীরের চমকে উঠবার কথা, কিন্তু এখন আর উঠল না। ইদানীং সেও ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। ধীর ভাবে বলল, কোথায় যাবো ?

কোথাও একটা চাকরি যোগাড় করতে পারবে না ?

তা হয়তো পারবো। কিন্তু এরা যে ছাড়বে না।

কেন ছাড়বে না ? ওদের টাকা চুকিয়ে দিলেই হলো।

সেটাও তো নেহাৎ কম নয়। কোত্থেকে দিই ?

সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ও-টাকা আমি দেবো। তুমি চাকরির চেষ্টা ছাখ।

সুবীর স্ত্রীর কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিল না। টাকাটা সংগ্রহ করাও ওর পক্ষে এমন কিছু কঠিন নয়, তাও বুঝল। তার পরের ব্যাপারটা যখন ভাবছে, সুতপা আবার এসে বলল, চাকরি তো ফস্ করে পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন ? আমি এখানেই কিছু দিন থাকি, তুমি বরং কোলকাতা চলে যাও। তোমার নিজের বাপ-মা-ভাই বোন, নিজেদের ফার্ম্। আমার জন্যে সব কিছু ছেড়ে দেবে কেন ?

এবার সুবীর চমকে উঠল। স্ত্রীর মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, বুঝতে পারল না, কী বলতে চায় সে। সুতপা আরো কাছে সরে এসে, ওর চেয়ারের পাশটিতে দাঁড়িয়ে কাঁধের উপর একটা হাত রেখে হালকা সুরে বলল, ভয় নেই, এখনি ডিভোর্স করতে বলছি না। বলছিলাম, প্রথমটায় একা গিয়ে ছাখ। ছেলেকে ওঁরা ফেলবেন না, তা জানি। সেই সঙ্গে বৌকেও যদি চান, তার দিক থেকে কোনো বাধা নেই। যেদিন ইচ্ছে, এসে নিয়ে যেও।

'আমি জানি,' সুতপার যে আঙুল কটি ওর কাঁধের উপর ছিল, নিজের হাতে নিয়ে গাঢ় স্বরে বলল সুবীর, 'আমার বাবা-মাকেও আমি চিনি। গোড়াতে যা-ই কেননা ঘটে থাকে, আমাকে আর তোমাকে তারা কখনো আলদা করে দেখবেন না।

সুতপা আর কোনো কথা না বলে নত হয়ে স্বামীর অন্য কাঁধের উপর চিবুকটা নামিয়ে দিল। সেই নিবিড় স্পর্শের ভিতর দিয়ে যে কথা বলা হল, সুবীর সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করল। চাঁপার মত কোমল, দীঘল আঙুলগুলো ওর বুক পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। তার উপর মৃদু আঘাত করে বলল, যদি যেতে হয়, আমরা দুজনে এক সঙ্গেই যাবো।

"যদি কেন বলছ ?" স্নিগ্ধ স্বরে বলল সুতপা। সুবীর সে কথার জবাব দিল না। স্বামীর হাত থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে সুতপা এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, এ তোমার অন্যায় অভিমান, সুবীর। এ তরফের ব্যাপারগুলো ভুলে যাচ্ছ কেন ? তা সত্ত্বেও তোমার বাবা আমাদের যাবার জন্যে লিখেছিলেন।

তা লিখেছিলেন, অতি নিস্তেজ ভাবে কথাগুলো যেন শুধু আউড়ে গেল সুবীর। তারপর বলল, কি জানো, তপা, আমার মাকে তো আমি সেই এতটুকু থেকে দেখছি। আত্মীয়-স্বজনদের কত অন্যায়, ছেলেমেয়েদের কত অত্যাচার যে মা মুখ বুজে সয়ে গেছে, শুনলে তুমি মনে করবে বানিয়ে বলছি। সেই মা আমাকে একটিবার ডাকল না!

সুতপা বলতে গিয়েছিল, তোমার অভিমান আছে, আর তাঁর বুঝি থাকতে নেই ? পারল না। মনে হল, স্বামীর নিগূঢ় অন্তরের এই গভীর বেদনাটুকু একান্তভাবে তারই, এখানে শুধু দুজন মানুষের স্থান আছে ; মা আর ছেলে, আর কেউ নয় ; স্ত্রীও এর অংশ নিতে পারে না। তার পক্ষে কোনো সান্ত্বনা দিতে যাওয়াও প্রগলভতা।

মিসেস দত্তের একটা মহিলা সমিতি ছিল। মাঝে মাঝে দু একটা সন্ধ্যা সেখান থেকে ডাক আসত। সেই সুযোগ নিয়ে সুতপাও বাড়ি গিয়ে কোনো রকম ভূমিকা না করে বলল, বাবা আমাকে কিছু টাকা দাও।

দত্তসাহেব একটু অবাক হলেন। মেয়ে তো এভাবে কখনো টাকা চায় না। বললেন, কী করবি?

—দরকার আছে।

কত টাকা?

তা তো জানি না। কত হলে কোম্পানী ওকে ছেড়ে দেবে, সেটা তুমি বলতে পার।

মিষ্টার দত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। কপাল রেখাময় হল। বললেন, ব্যাপারটা কী, বলত?

ব্যাপার কিছু নয়। ও এখানে থাকতে চাইছে না। আমার মনে হয়, অন্য কোথাও চলে যাওয়াই ভালো।

কোথায় যাবে? চাকরি-টাকরি ঠিক করেছে কিছু?

—এখনো করেনি।

ওর বাবার ফ্যাক্টরীতে যদি যেতে চায়, আমি বলবো সেটা ঠিক হবে না। আমি যদ্দূর জানি, সে অতি ছোট ব্যাপার। মানে, ওর মত একটি ব্রাইট ছেলের কেরিয়ার হিসাবে কিছু নয়।

—ওর ঝোঁক আসলে বিজ্‌নেসের দিকে। টাকা দিতে পারে এমন কোনো ভালো পার্টনার পেলে চাকরি না খুঁজে এখন থেকেই শুরু করতে পারত।

নট্ এ ব্যাড্ আইডিয়া। আমারো এক সময়ে ইচ্ছা ছিল, বিজনেস করবো। হল কৈ? চাকরির পাঁকে কিছুদিন ঘুরবার পর আর বেরিয়ে আসা যায় না। ঘানির বলদ কি আর চাষের কাজে লাগে? আচ্ছা সেদিকে আমি বরং কিছু সাহায্য করতে পারবো। সুবীরকে একবার দেখা করতে বলিস।

আর শোনো—কোনো একটা অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় বলতে যাচ্ছে, এমনি ভাবে বাবার মুখে চোখ রাখল সুতপা,—মা যেন এসব কিছু জানতে না পারে।

দত্তসাহেব হাসলেন, সে কথাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে মা-মনি? এদিকে এসে বোস।

উপরের দক্ষিণ-খোলা বারান্দায় আরাম চেয়ারে শুয়ে ছিলেন বীরেশ্বর দত্ত। সুতপা গিয়ে বসেছিল তার পায়ের দিকটায়। বাবার সস্নেহ আহ্বানে চেয়ারটা টেনে নিয়ে তাঁর কাছটিতে গিয়ে বসল। মেয়ের পিঠের উপর হাত রাখলেন দত্তসাহেব। বললেন, আমি সব বুঝি। কিন্তু কী করবো বল। যে কদিন আছি এমনি করেই কাটবে। তোদের কথা আলাদা। তুই ভাবিস না। আমার যেটুকু সাধ্য, আমি করবো।

সুতপা আর কোনো কথা বলল না। ঝুঁকে পড়ে বাবার বুকে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

দিন কয়েক পরেই কোম্পানীর একজন শাঁসালো কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বললেন দত্তসাহেব। জামাতার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন। লোকটি সিন্ধী, জব্বলপুরের ওদিকে কোথায় সিমেন্টের কারখানা আছে। প্রচুর টাকার মালিক। এবার ইচ্ছা হয়েছে, রপ্তানি ব্যবসায়ে নামবেন। খবর নিয়ে জেনেছেন, দূর-প্রাচ্যে এবং পূর্ব-আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে, যারা নতুন শিল্পায়ন শুরু করেছে, নানা রকম ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্যের বিপুল চাহিদা। ওখানকার বাজারগুলো হাতকরা খুব কঠিন হবে না। কঠোর প্রতিযোগিতার আশঙ্কা নেই। তার কারণ কিছুটা রাজনৈতিক, অর্থাৎ ইয়োরোপ-আমেরিকা সম্পর্কে ওরা ভীষণ স্পর্শ-কাতর। পূবে পেলে আর পশ্চিমের দিকে হাত বাড়াবে না। ভয় শুধু জাপানকে। তার সম্বন্ধেও কোনো কোনো রাষ্ট্রের বিরূপ মনোভাব রয়েছে। সেগুলোকে অন্তত পাওয়া যাবে।

মাল চেনে, কোথায় কী ফাঁকি আছে ধরতে পারে, এমন একজন এঞ্জিনিয়ারই খুঁজছিলেন ভদ্রলোক। মাইনে-করা চাকরে নয়, অংশীদার হিসাবেই নেবেন। যোগাযোগ ঘটে গেল। চীফ্ এঞ্জিনিয়ারের জামাই ; তাছাড়া সুবীরের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও তিনি, যাকে বলে, ইম্‌প্রেস্‌ড্ হলেন। বুঝলেন, একে দিয়ে কাজ চলবে। অফিস হলো বম্বেতে। সুবীরকে ওখানেই থাকতে হবে। ফ্ল্যাটও ঠিক হয়ে গেল।

মিসেস দত্ত মেয়ের সংসারের তদারকি যথারীতি চালিয়ে যেতে লাগলেন। ভিতরে ভিতরে সেখানে যে একটু একটু করে গোটাবার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে, জানতে পারলেন না।

যখন পারলেন, তখন ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে।

এই দিনটি সম্বন্ধে সুতপার মনে গভীর আশঙ্কা ছিল। মাকে নিয়ে যতখানি, তার চেয়ে বেশী তার স্বামীটিকে নিয়ে। তার শিরদাঁড়ার জোর তো সে ভালো ভাবেই জানে। শাশুড়ীর দুর্জয় চাপে শেষ মুহূর্তে সেটা ভেঙে পড়াও আশ্চর্য নয়। সে মেয়ে। তার যা কিছু করবার নেপথ্য থেকেই করতে হবে। এ ব্যাপারে সামনে এসে দাঁড়ানো চলবেনা। ওদিকে বাবার অবস্থাও প্রায় তাই। স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কন্যা-জামাতাকে সমর্থন করবেন, এ আশা একেবারেই নেই। বিশেষ করে, টাকাটার উৎস গোপন রাখবার জন্যে তাঁকে বরং খানিকটা নির্লিপ্ত থাকতে হবে। সুতপা নিজেই তাঁকে সে বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে এসেছে।

কিন্তু মায়ের কাছে কথাটা পাড়বার ভার তাকেই নিতে হবে। সেটা সুবীরের উপর ছেড়ে দিতে পারেনা। স্বামীর অভিপ্রায় এবং ব্যবস্থামত তার হয়েই বলতে এসেছে, এমনি ভাবেই অবশ্য তুলতে হবে প্রসঙ্গটা, যাতে করে মা বুঝতে না পারেন এ ব্যাপারে সে-ই অগ্রণী। তারপর তিনি যা-ই ধরে নিন। আর দেরি করা চলে না। মায়ের তীক্ষ্ণ এবং সজাগ দৃষ্টির সামনে এদিকের

আয়োজনটাকে বেশী দিন ঢেকে রাখা সম্ভব হবেনা। এরা গোপন করে গেছে, তিনি অন্য সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন—সেটা বড় অশোভন এবং অনুচিত। সুতপার ইচ্ছাও তা নয়। মাকে বলে, বুঝিয়ে, তাঁর আশীর্বাদ এবং শুভ কামনা নিয়েই সে যেতে চায়।

এখান থেকে দূরে কোথাও যাবার জন্যে একদিন যেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, যাওয়া যখন স্থির হয়ে গেল, তখন যেন মনটা আবার ঝিমিয়ে যেতে চাইছে। নানা জায়গায় টান পড়ছে। এতটা বয়স পর্যন্ত মাকে ছেড়ে সে কোথাও যায়নি। মাও তাকে ছেড়ে থাকেনি। এ যাওয়া দুদিকেই বাজবে। তবু বলতে হবে। কিন্তু তার মধ্যে যেন কোনো তিক্ততার স্পর্শ না লাগে, কোনো অপ্রীতির কাঁটা না থেকে যায়।

সুতপা ভাবছিল, মা যদি বুঝত, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, এবার সে যেখানে হোক নিজের সংসার পাতবে, নিজের ঘর নিজের মনের মত করে গুছিয়ে নেবে, সেইটাই স্বাভাবিক, সব বাপ-মাই সেই কামনা করে, তাহলে সবটাই সুখের হত। এখানকার চাকরি ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি অন্যত্র যাবার প্রয়োজনও হয়তো দেখা দিতনা।

কিন্তু অত বুদ্ধিমতী হয়েও মা যেন ঐ একটা জায়গায় অন্ধ। তাই যে যাওয়াকে একটি সাধারণ ঘটনার মত সকলের সমক্ষে, সমবেত শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে সহজ ও শোভন করে তোলা যেত, তারই জন্যে কত সন্তর্পণে অগ্রসর হতে হচ্ছে! এরও কোনো প্রয়োজন ছিলনা।

যা-ই হোক, জানাতে হবেই এবং সেটা অবিলম্বে।

'ও বম্বেতে চাকরি পেয়েছে, আমরা চলে যাচ্ছি'—এমনি একটা সাধারণ ধরণের প্রস্তাব নিয়ে গেলে মা একরাশ প্রশ্ন করে তার মধ্যে অনেক গলদ বের করে ফেলবে। এর চেয়ে আরো জোরালো কিছু তার হাতে থাকা দরকার, যাকে উড়িয়ে দেওয়া মার পক্ষেও কঠিন হবে। তার জন্যে সুতপাকে আবার তার বাবার দ্বারস্থ

হতে হল। বাড়িতে সে সুযোগ পাওয়া মুস্কিল। আগে আগে বাবার আফিসেও কখনো কখনো হঠাৎ গিয়ে হাজির হত। সি. ঈর এই আদরের কন্যাটিকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং অন্যান্য পদস্থ অফিসারেরা স্নেহের চক্ষে দেখতেন। বিয়ের পর আর যায়নি। এখন আর সে শুধু কন্যা নয়, স্ত্রী, এবং এখানকারই একজন জুনিয়র এঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী। কথায় কথায় ছুট করে বাবার অফিসে গিয়ে ওঠা চলে না। স্বামীর প্রাক-বিবাহ জীবনের বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছেও তার স্থানটা এখন অন্য রকম।

সুতরাং চাকরের হাতে বাবাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিল। এক লাইনের চিঠি—বাবা, বাড়ি ফেরার পথে এখান থেকে চা খেয়ে যেও।

দত্তসাহেব বেশ একটু আগে আগেই এসে পড়লেন। সুতপা তখনো রান্নাঘরের কাজ সেরে বেরোয়নি। চায়ের দু একটি অনুপান সে নিজে হাতে তৈরি করছিল। জুতোর শব্দ পেয়ে সেখান থেকেই ডাকল, বাবা!

—কীরে? কোথায় তুই?

—এই তো। এসোনা? আজ যে তোমার এত শীগগির কাজ সারা হয়ে গেল?

—আমার কাজ কি কখনো সারা হয় মা মণি? তোর রান্নার লোভে পালিয়ে এলাম। আহা, একটা ভুল হয়ে গেল যে?

—কী ভুল হল?

—সুবীরকে একটা খবর দিয়ে এলে হত। এমনিতে তার আসতে দেরি হবে।

—তা হোক। তাকে তো বলিনি, শুধু তোমার নেমন্তন্ন।

—"তাই নাকি!"—উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন দত্তসাহেব, "নেমন্তন্নের আয়োজনটা একবার দেখি?"

রান্নাঘরের সামনে গিয়ে ভিতরে উঁকি মারলেন। সুতপা তাঁকে খানিকটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, বাঃ, আগে দেখতে দেবো কেন?

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি চোখ বন্ধ করলাম। একেবারে খাবার টেবিলে গিয়ে খুলবো।

চায়ের সঙ্গে কয়েকটি তুচ্ছ কিন্তু মুখরোচক খাদ্যের উপর মিষ্টার দত্তের প্রবল আসক্তি ছিল—যেমন, বেগুনি, তালের বড়া, আলু-কাবলি ইত্যাদি। সবগুলোই জাতে ছোট, এবং অনেকটা সেই কারণেই মিসেস দত্তের চুচক্ষের বিষ। দত্তসাহেবের এই সাধারণ-জন-সুলভ প্রবৃত্তি তাঁর কাছে কোনোদিন প্রশ্রয় পেতনা। স্বামীর পুরোপুরি খাদ্য-তালিকা তিনিই স্থির করে দিয়েছিলেন, এবং তা নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত ছিলনা। বলতেন, ওঁর কোন্টা ভালো লাগে, উনি কী বোঝেন? সে সব আমি জানি।

জানেন যে এবং তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না, হাতে কলমে তার প্রমাণও দিতেন। তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন প্রচুর ব্যয়ে নানারকম উচ্চ পর্যায়ের সুখাদ্য তৈরী হত 'সাহেবের' জন্যে, এবং তাঁকে সেগুলো অম্লান বদনে গলাধঃকরণ করতে হত। বলবার উপায় ছিলনা, এটা আমার ভালো লাগছে না। বরং খেতে খেতে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠতেন বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো।

একদিন কী একটা রান্নায় নুন দিতে ভুলে গিয়েছিল বাবুর্চি। দত্তসাহেব সেটা মুখে দিয়েই মন্তব্য করলেন, খাসা রেঁধেছে। সমর্থনের জন্যে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন। তিনি নুনের পাত্রটা প্লেটের উপর জোরে জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মুখ বিকৃত করে বললেন, নুন ঝালটাও বোঝনা?

খাবার টেবিলে বাবার এই অসহায় মূর্তি সুতপা প্রত্যহ লক্ষ্য করত, তাঁর যন্ত্রণাটা অনুভব করে কষ্ট পেত। কিন্তু তার করবার কিছু ছিলনা। কখনো ক্বচিৎ মা কোথাও গেলে বাবুর্চিকে দিয়ে

কিংবা নিজে হাতে বাবার দু-একটা প্রিয় রান্নার ব্যবস্থা করত।

আজও তাই করেছিল। দত্তসাহেব ভীষণ খুশী। ব্যসন দিয়ে আলু ভাজাটা আরো কয়েকখানা নেবার ইচ্ছা ছিল। সুতপাই বাধা দিল, "থাক, ভাজা জিনিস তো। বেশী খেলে তোমার শরীব খারাপ করতে পারে।

খাবার পর একথা-ওকথার পর সুবীরের নতুন কাজের কথা উঠতেই সুতপা বলল, কই, ওরা তো আর চিঠি-পত্তর কিছু দিলনা।

—আবার কি চিঠি দেবে? ওদিকে সব কিছু ঠিক হয়ে আছে। এখন সুবীর এখান থেকে ছাড়া পেলেই হল।

—তবু যাকে লেটার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বলে, তেমন ধারা কিছু একটা—

—এটা তো কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট্ নয় যে লেটার অব্ অ্যাপয়েন্টমেন্ট্ দেবে। পার্টনারশিপ্ বিজনেস্। তার জন্যে দলিল-পত্তর যা দরকার সব হয়ে গেছে। কেন, সুবীর কিছু বলেছে নাকি?

—না, ও কিছু বলেনি। আমিই জিজ্ঞেস করছিলাম। মাকে তো এখনো জানানো হয়নি। ওদের কাছ থেকে একটা কিছু তাগিদ টাগিদ পেলে সুবিধে হত।

দত্তসাহেব হেসে উঠলেন—তা মন্দ বলিসনি। পিঠে বাঁধবার মত একটা কুলো চাই। কিন্তু তাতে করে পুরোপুরি পিঠ বাঁচাতে পারবে বলে তো মনে হয়না। তবু যতটা হয়, এই তো? আচ্ছা, কালই বোধ হয় পানোয়ানীর সঙ্গে আমার দেখা হবে। কোলকাতায় গেছে। এখানটা হয়ে ফিরবে। বলে দেবো, বম্বের আফিসে পৌঁছেই যেন একটা টেলিগ্রাম করে দেয়।

দিন তিনেকের মধ্যেই পানোয়ানীর টেলিগ্রাম এসে গেল।

সুবীরের নামে আফিসের ঠিকানায়—'এখানে সব তৈরী, অবিলম্বে চলে আসুন।'

সুবীর ভিতরের ইতিহাস জানত না। তার পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। লাঞ্চ্ খেতে বাসায় এসেই সেটা সুতপার হাতে দিয়ে বলল, আর দেরি করা চলেনা।

সুতপা বলল, এদিকের কদ্দূর? ছাড়া পেয়েছ? মানে, যাকে বলে ছাড়পত্তর।

—সব রেডি হয়ে আছে। চাইলেই পেয়ে যাবো।

—আজই তাহলে মাকে বলতে হয়।

—এখনো বলনি নাকি?

—না, এটার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

হাতের টেলিগ্রামটা দেখিয়ে দিল।

সুবীর কয়েক সেকেণ্ড্ কী ভেবে নিয়ে বলল, এক কাজ কর; আজ না বলে কাল সকালে গিয়ে বল।

—কেন?

—আমি কাল পরশু দুটো দিন ছুটি নিয়ে একটু বাইরে যাবো ভাবছি। তোমাকে তো ও বাড়িতে গিয়েই থাকতে হবে। সেই ফাঁকে—

—এ সময়ে আবার কোথায় যাবে?

—একটু কোলকাতা থেকে ঘুরে আসি।

সুতপা স্বামীর মুখের পানে তাকাল। একটু সময় নিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, ওঁদের সঙ্গে দেখা করে যাবে?

—না; অন্য কাজ আছে। তাছাড়া দু-এক জন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও মীট্ করতে চাই। অত দূরে চলে যাচ্ছি।

সুতপা ভালোভাবেই জানে, সেরকম বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, থাকলেও তাদের সঙ্গে দেখা করবার কোনো তাগিদ সে স্বামীর মধ্যে একদিনও দেখতে পায়নি। 'বাইরে যাবার' আসল উদ্দেশ্যটা

বুঝে ফেলতে তার এক মিনিটও লাগলনা। ঠোঁটের কোণে একটি দুষ্টুমি ভরা হাসি ফুটে উঠল। সুবীর স্বভাবতই তার সামনে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, এবং সেটা কাটাবার জন্যে বলল, হাসছ যে?

—পালিয়ে কতক্ষণ থাকবে?

সুবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, "কী যে বল? পালাবো কিসের জন্যে?" ইত্যাদি। কিন্তু গলায় বিশেষ জোর ফুটল না। সুতপা আশ্বাসের সুরে বলল, ভয় নেই। প্রথম ঝড়টা তো আমার ওপর দিয়েই যাবে। পরের দুচারটা ঝাপটা যদি সামলাতে না পার বিয়ে করেছিলে কেন? তোমাকে এবার একটু শক্ত হতে হবে, বুঝলে মশাই? কদিন আর বৌএর আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকবে?

—লুকিয়ে মানে? কী যে ভাব তুমি আমার সম্বন্ধে—বলে, বোতাম খোলা কোটের দুটো ধার ধরে ঝাঁকানি দিয়ে খাড়া হয়ে বসল।

সুতপা বলল, আচ্ছা, এবার কাজের কথায় আসা যাক। মা কিন্তু প্রথমেই জানতে চাইবে, টাকাটা কে দিলে। আমি বলবো তুমি বাড়ি থেকে আনিয়েছ। তোমাকেও তাই বলতে হবে।

সুবীরের মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তারপর?

—কী তারপর? মা বিশ্বাস করবেনা, বলছ?

—না, মানে, বাবা টাকা দিলেন, অথচ আমি তাঁর কাছে না গিয়ে চললাম বম্বে। ব্যাপারটা একটু কেমনধারা নয় কি?

সুতপাও সেটা মনে মনে অস্বীকার করতে পারল না। ভাবতে লাগল। ও প্রসঙ্গে আর না এগিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল—নিলয়বাবু এখানে আছেন তো?

—আছে। কেন?

—সন্ধ্যার পর একবার যদি আসতেন—না, থাক, তাঁকেই বরং বাসায় থাকতে বলো।

—তুমি যাবে?

—হ্যাঁ। কিন্তু সেকথা কিছু বলো না।

—আমি কিন্তু যেতে পারবো না।

—কেন?

—বেশ কিছু কাজ জমে গেছে। পাঁচটার পর ঘণ্টা দুয়েক করে না বসলে এ কদিনে সারা যাবেনা।

—ও, তার মানে এ্যাদ্দিন মনের আনন্দে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে।

—তা কী করবো? আমি তো আর ইচ্ছে করে ফাঁকি দিইনি।

—তবে?

ভ্রূকুঞ্চিত করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সুতপা।

সুবীর জবাব দিলনা, কিন্তু তার চোখ এবং সেখানে যে হাসিটি ফুটে উঠল, তার থেকে সুতপার বুঝতে কিছুই বাকী রইলনা। তবু অজ্ঞতার ভান করে বলল, চুপ করে রইলে যে? ভাবছ, কার ঘাড়ে দোষ চাপানো যায়?

—ভাববার আর কী আছে? ঘড়িই সেটা বলে দিচ্ছে। দুটোয় ফিরবার কথা, আর এখন?—বলে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ধরল।

সুতপা মুখ টিপে হাসল। সে তো জানে, শুধু আজ নয়, ঘড়ি প্রায় রোজই এই কথা বলে। নীরবে জানিয়ে দেয়, লাঞ্চের ঘণ্টা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। কিন্তু দুজনের কারুরই সেদিকে হুঁস থাকেনা। কোনো কোনো দিন হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে সুবীর হয়তো বলে ওঠে, ঈস্, বড্ড দেরি হয়ে গ্যাছে, এবার চলি। সুতপা বাধা দেয়না বটে, কিন্তু তার মুখে বা হাবভাবে স্বামীকে বিদায়

জানাবার কোনো লক্ষণও ফুটে ওঠেনা, যদিও সে আফিসের নিয়ম শৃঙ্খলা সব জানে, এবং সুবীর সেটা মেনে চলুক, তার কাজের কোনো ক্ষতি না হোক, তাও নিশ্চয়ই চায়।

'চলি' বলে উঠে দাঁড়াবার পরেও সুবীরের পা দুটো চলতে চায়না। কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করে। ওদিকে ঘড়ি আপন মনে এগিয়ে যায়।

কোনোদিন এমনও হয়, ঘড়ির কাঁটাগুলো যে বড় বেশী এগিয়ে গেছে, সে খবরটা সুতপাই আগে জানতে পারে। সুবীরের সেদিকে খেয়াল নেই দেখেও তো একবার মনে করিয়ে দেয়না।

সুতরাং সুবীর যদি তার ফাঁকির দায়িত্ব সবটুকু নিজের ঘাড়ে না নিয়ে কিছুটা অন্ততঃ আর একজনের উপর চাপাতে চায়, তাকে দোষ দেওয়া যায়না। সুতপাও সেটা নিজের কাছে অস্বীকার করবেনা। কিন্তু মনে মনে মেনে নিলেই কি সব কথা মুখেও কবুল করা যায়? অন্ততঃ তাঁর একটি সৃষ্টির বেলায় বিধাতা সে বিধান রাখেননি। তার নাম স্ত্রীজাতি। সুতপা তারই অন্তর্ভুক্ত, এবং সে সৃষ্টিছাড়া নয়। তাই এতদিনের গাফিলতির সব দায় এবং দোষ সে অম্লান বদনে স্বামী বেচারার মাথায় চাপিয়ে দিল।

ঘড়িবাঁধা হাতখানায় একটা ঠেলা দিয়ে বলল, আমাকে ঘড়ি দেখিয়ে কী হবে? আমি সাতজন্মেও কাউকে আফিস পালাতে বলিনি।

—বলনি?

—না।

—বেশ কাল থেকে তাহলে পরম আরামে ক্যান্টিনে বসে আবদুলের মটন কারী নামক—

—থাক, অত আরামে দরকার নেই।

—তবে কি? হরিবাসর?

—বাঃ, তা কেন? খেতে আসতে তো বারণ করিনি। খাবে, আর লক্ষ্মীছেলের মত তখ্‌খনি গিয়ে কাজে লাগবে। খাবার পর রোজ রোজ এই সব—

স্ত্রীকে থেমে যেতে দেখে সুবীর দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, কী সব?

—"কী আবার?" ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সুতপা, "এই যা কর রোজ?"

—কী করি?

—জানিনা, যাও।

সুবীর যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সুতপাও উঠে এল স্বামীকে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্যে। কাছাকাছি এসেও তার মতলবটা বুঝতে পারেনি। যখন পারল, তখন দুটি বলিষ্ঠ বাহুর নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে। ঠোঁট দুখানাও মুক্ত নয় যে প্রতিবাদ জানাবে। পরক্ষণেই জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চারদিকে তাকিয়ে চাপা ধমকের সুরে বলল, চাকরটা রয়েছে না?

"ও, তাহলে—" বলে বাঁ হাতে কোমর বেষ্টন করে সুবীর যখন তাকে ঘরের দিকে আকর্ষণ করল, তখনো অবশ্য একবার 'না' বলে আপত্তি জানাতে ছাড়ল না, কিন্তু দেহ বা মনের কোনোখানে তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনির আভাসটুকুও পাওয়া গেলনা।

নিলয় কিছুই জানত না। সহকর্মিমহলে একটা কানাঘুষা শুনেছিল, সুবীর বলে যাচ্ছে; কোম্পানীর পাওনাও মিটিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। বিশ্বাস হয়নি। এতবড় একটা ব্যাপার! সত্য হলে সুবীর নিশ্চয়ই তাকে বলত। যদিও ইদানিং তাদের বাইরের যোগসূত্রটা অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, কথাবার্তাও ছিল বিরল, তবু সৌহার্দ্যের অভাব তো কিছু ঘটেনি। অন্যত্র চাকরি

পাওয়াটা এমন কিছু ঘটনাও নয়, যা তার কাছে গোপন রাখবার কারণ থাকতে পারে।

বিশ্বাস না করবার সব চেয়ে বড় কারণ—কোম্পানীর পাওনা তো কম নয়, সুবীর সেটা মিটিয়ে দেবে কেমন করে। তার নিজের হাতে টাকা নেই। বাড়ি থেকে আনালে নিলয় জানতে পারত। তাছাড়া বাড়ির সঙ্গে বর্তমানে যে সম্পর্ক, সে প্রশ্নই ওঠেনা।

সেদিন ফ্যাক্টরি বন্ধ হবার একটু আগে সুবীর তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে আগাগোড়া ঘটনাটা যখন মোটামুটি জানিয়ে দিল, নিলয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সব একেবারে ঠিক হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ, তা এক রকম ঠিক বই কি ? তোমাকে বলব বলব করেও বলা হয়নি। আসলে ওদিকে কদ্দূর কী হচ্ছে, আমিও জানতাম না। তপাই সব করছে। পেছনে আছেন কত্তা, টাকাটাও তিনি দিয়ে দিয়েছেন।

—বল কী! মিসেস্ রাজী হলেন ?

—তিনি এখনো জানতেই পারেননি।

—কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে—

—না ; জানাতে হবে নিশ্চয়ই। সে-সব তপা বুঝবে। মা-মেয়ের ব্যাপার, আমি ওর মধ্যে নেই। সে যাক গে। তুমি সন্ধ্যাবেলা আছ তো ?

—আছি।

নিলয় প্রথমটা একটু আঘাত পেয়েছিল—এত কাণ্ড হয়ে গেল, আর সুবীর তাকে একটিবার জানাল না। এবার আর কোনো ক্ষোভ রইল না। বুঝল, ব্যাপারটা আর কিছু না, হাত বদল। তার বন্ধুটির ভূমিকা একই আছে। দাবার বড়ে। এতদিন চাল দিচ্ছিলেন শাশুড়ী, এবার দেবে স্ত্রী। সেই সঙ্গে মায়ের কবল থেকে মুক্তি চাইছে মেয়ে।

এই 'মায়ের' জন্মেই নিলয় নিজেকে তার প্রিয়বন্ধু এবং বন্ধু-পত্নীর প্রীতিপূর্ণ সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে এনেছিল। এত কাছে থেকেও এই দূরত্ব শুধু বেদনাদায়ক নয়, দৃষ্টিকটু। এই সরে আসা উপলক্ষ করে চারদিক থেকে বিদ্রূপ লাঞ্ছনাও তাকে কম সইতে হয়নি। তবু তাকে নিয়ে ওদের জীবনে কোনো অশান্তি বা জটিলতার সৃষ্টি হয়, তা সে চায়নি।

আজ ওরা নিজেরাই দূরে চলে যাচ্ছে। স্নেহ-প্রীতি ভালোবাসার বন্ধন সকলেই কামনা করে। কিন্তু সে বন্ধন যখন শিকল হয়ে দাঁড়ায়, তাকেই আবার ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্মে ছটফট করতে থাকে। মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় আকাঙ্খিত বস্তু মুক্তি, নিজেকে মেলে ধরবার মত অবাধ অবকাশ। সেই ফাঁকটুকু যদি না পায়, মায়ের স্নেহ, দয়িতের প্রেম, ঐশ্বর্যের আরাম সব কিছুই তার কাছে বিস্বাদ।

এদের এই চলে যাওয়াকে নিলয় সেদিক দিয়ে সর্বান্তঃকরণে শুভেচ্ছা জানাল। সে তো জানে, শুধু সুখ নিয়ে সুখী হওয়া যায় না, যদি তার সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য না থাকে। একটি নব-বিবাহিত দম্পতির পক্ষে সেটা আরো সত্য। সেই জন্মেই লোকে আশীর্বাদ করে—তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কর।

সুবীর ও সুতপার সুখের অভাব নেই, কিন্তু স্বচ্ছন্দ হতে পারছিল না। এবার ওরা সুখী হোক, ওদের মিলন পূর্ণ হোক। তার চেয়ে বড় কামনা নিলয়ের আর কী আছে ?

কিন্তু আরেক দিকে নিলয়ের মনের কোণে একটা নৈরাশ্যের ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল। না ; তার নিজের কথা ভেবে নয়, যদিও একটা শূন্যতা বোধ বার বার তার বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠছিল। এরা যেদিন চলে যাবে, তার পর সে একেবারে একা। এতদিন বিশেষ আসা যাওয়া না থাকলেও, দেখাশুনো হত, কথাবার্তা হত। সে ওদের কাছে যেতনা, কিন্তু সুবীর মাঝে মাঝে

ঘুরে যেত। সুতপা আসত না, স্বামীর মুখে আসত তার উদ্বেগভরা কুশল প্রশ্ন, ভৃত্যের হাতে আসত দুটি একটি সযত্নে তৈরী মিষ্টান্ন, তার সঙ্গে জড়ানো একটি মিষ্ট মনের দরদ, প্রীতি। সে সব আর আসবেনা। ও দিকটা তার একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

কিন্তু এই মুহূর্তে এসব কথা সে ভাবছিল না। সুতপাকে দিয়ে সে যে মনে মনে একটি নতুন আশা-সৌধ গড়ে তুলেছিল, সেটা হঠাৎ মাঝপথে ভেঙে পড়ল। তারই আঘাত তার মনটাকে নিরাশায় ভরে তুলেছিল।

মালতীর সঙ্গে সেদিনকার সেই সামান্য দুটি কথা, যদিও তার ভিতরে ছেলের সম্পর্কে তাঁর মনের স্পষ্ট রূপটা ধরা দেয়নি, তবু নিলয়ের কাছে একটি শুভ ইঙ্গিত বয়ে এনেছিল। সেদিন থেকেই সে ভাবছিল, এবার তার প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে তাঁব ছেলে-বৌকে একসঙ্গে তাঁর পায়ের কাছে নিয়ে ফেলা। এতদিন তার উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরী হয়নি। এবার হয়েছে। যার হাত দিয়ে হয়েছে, তাঁর নাম কাল। সেই সব করে। তিক্ততার স্বাদ ভুলিয়ে দেবার, ক্ষতকে নিরাময় করবার অতবড় ওষধি আর নেই। মানুষ বোঝেনা বলেই তাড়াহুড়া করতে যায়, অসময়ে হাত লাগিয়ে সহজকে জটিল করে তোলে। এসব ক্ষেত্রে সুফল লাভের একমাত্র উপায় অপেক্ষা করা। নিলয় এতদিন ধরে তাই করে এসেছে।

আরো একটা কারণে তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। সুবীর যা-ই কেননা করে থাক, তার মন তো নিলয়ের অজানা নয়। তার দিক থেকে কোনো ভাবনা ছিলনা। ভাবনা ছিল, যে নতুন মানুষটি তার জীবনে এসে দাঁড়াল, তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ সূত্রে বাঁধা হয়ে গেল, তাকে নিয়ে। সেই সূত্রটা কত বড়? সে কি শুধু একজনকে জড়িয়েই ফুরিয়ে যাবে? না, সেই একজন এতদিন যাদের নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল, তাদের দিকেও এগোতে পারবে? সে কি শুধু রুদ্র

পরিবারের পদবীটা নিয়েই ক্ষান্ত হবে? না, সেখানকার মানুষ কটিকেও গ্রহণ করবার অভিলাষী?

মিসেস দত্ত অজ্ঞাতসারে নিলয়ের একটা মস্তবড় উপকার করেছিলেন। তাঁরই ব্যবস্থায় সে খুব কাছে থেকে বেশ কিছুদিন ধরে সেই নতুন মানুষটিকে দেখবার, চিনবার, তার আশা আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা, সংস্কার এবং সবার উপরে তার মনের আসল রূপটা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিল। পেয়ে তার সব ভাবনা দূর হয়েছিল।

সুতপাকে সরাসরি কোনো প্রশ্ন না করেও নিলয় বুঝতে পেরেছিল, মা এবং মেয়ে একেবারে বিভিন্ন ধাতুতে তৈরী। মিসেস্ দত্ত শুরু থেকেই শুধু জামাতাটিকে চেয়েছিলেন, এবং তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে মনে করলেন, সব হল। তাঁর কন্যাটি স্বামীকে একান্ত করে চাইলেও তার পরিজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পেতে চায় না। শুধু স্ত্রী নয়, বধূ হবার আকাঙ্ক্ষাও সে মনে মনে পোষণ করে। সে বিষয়ে নিলয় নিশ্চিত হতে পেরেছিল।

এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনো একটা শনিবার সন্ধ্যায় সে এই নবদম্পতিটিকে নিয়ে হঠাৎ গিয়ে হাজির হবে নিউ সাউথ পার্কের বাড়িতে—এতদূর পর্যন্ত নিলয়ের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আগে থেকে কোনো খবর দেওয়া হবে না। খবর দেবার মত কিছু নেই। নিতান্তই সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনা। ছেলে তার কর্মস্থল থেকে বৌ নিয়ে বাড়ি এসেছে বাপ-মা ভাই-বোনের সঙ্গে সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাতে। আগে আগে যেমন আসত। এই বৌটিই শুধু সত্য, তার আবির্ভাব উপলক্ষ করে দুতরফে যা কিছু ঘটেছে, যত কিছু মনান্তর, সব একটা দুঃস্বপ্নের মত অলীক। বিয়ের পর থেকে ঐ দিনটি পর্যন্ত সবটাই একটা সমাপ্ত অধ্যায়। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হল। সে পাতাগুলো আর খোলা হবে না।

রবিবারটা কাটিয়ে পরদিন ভোরের গাড়িতে দুবন্ধুতে ফিরে আসবে। থেকে যাবে সুতপা। ছেলে তার অসতর্ক হাতের স্থূল আঘাতে যে স্বর্ণসূত্রটুকু একদিন দুভাগ করে ফেলেছিল, বৌ তার নিপুণ হাতের কোমল স্পর্শ দিয়ে সেই ছেঁড়া ধার দুটো জুড়ে দেবার ভার নেবে। এবং সেটা সে যে সহজেই পারবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার জন্যে শুধু একটু সময় চাই।

কিন্তু সে সময় দেবার সুযোগ আর এলনা। নিতান্ত এক অকল্পিত দিক থেকে ছুটে এল বাধা। ঘটনার ধারা বয়ে গেল অন্য খাতে। নিলয়ের সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে গেল।

সুবীর ও সুতপাকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলল একেবারে ভিন্ন পথে। কে জানে কোথায় গিয়ে পড়বে তারা, আজকের এই অনুকূল আবহাওয়া কী রূপ নেবে সেখানে, এই উন্মুখ মন বিমুখ হয়ে দাঁড়াবে কিনা? সবই রইল অনিশ্চয়ের গর্ভে।

আসন্ন বন্ধুবিচ্ছেদের চেয়ে এই ভাবনাটাই নিলয়কে পীড়া দিতে লাগল।

সুবীর যখন জানতে চাইল, সন্ধ্যার পর সে বাসায় থাকবে কিনা, নিলয় তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি। স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিয়েছিল, ও আসতে চায়। চলে যাবার এখনো কিছু দেরি আছে; তার আগে দুবন্ধুতে একটু মুখোমুখি বসতে চায়, আগেকার দিনে যেমন বসত। কোথা দিয়ে কত ঘণ্টা কেটে যেত, হুঁস থাকত না। সুবীরের বিয়ের পরেও তার সাজানো বাংলোর দক্ষিণের বারান্দায় এমনি অনেক সন্ধ্যা তাদের কেটেছে। শুধু দুখানার বদলে তিনখানা চেয়ার, মাঝখানে একটি ছোট্ট টেবিল।

তৃতীয় ব্যক্তিটির আগমন তাদের আড্ডার চেহারা এবং ধরণও কিছুটা বদলে দিয়েছিল। দুবন্ধুতে যে কথা চলে, একটি তরুণীর সামনে তার উপরে একটা বলগা পরাতে হয়—যদিও সে

একজনের স্ত্রী, আর একজনের বন্ধুজায়া এবং বলা যেতে পারে বান্ধবী।

কিন্তু কোনো কোনো দিকে রাশ টানার দরকার হলেও সে কথার গতি বা বেগ কখনো ব্যাহত হয় না। সে তখন নতুন দিকে পথ করে নেয়, নতুন রূপ এবং রসস্পর্শে স্বাদু ও রমণীয় হয়ে ওঠে।

ওদের বেলাতেও তাই হয়েছিল। তারপর একদিন একটি চেয়ার খালি করে দিতে হল। সেটা কিছু নতুন নয়, অস্বাভাবিকও নয়। বনিতার উদয় হলে বন্ধুকে সরে আসতে হয়। এক আকাশে সূর্য ও চন্দ্রের স্থান নেই। এ ক্ষেত্রে কে চাঁদ, কে সূর্য, সে প্রশ্ন অবান্তর। যে যা-ই হোক, দুজন থাকতে পারে না। থাকলেও কিছুক্ষণের জন্যে, এবং অনেকটা প্রচ্ছন্ন রূপে। নিলয় যেমন ছিল। তবে তার প্রস্থানটা ঠিক স্বাভাবিক কারণে ঘটেনি। সেই জন্যেই কিছু ক্ষোভ রয়ে গেছে। সে যাক।

আজ দূরে চলে যাবার আগে সুবীর আসছে তার কাছে। যাকে বিদায় নেওয়া বলে, এটা ঠিক তা নয়। তার জন্যে হয়তো আরেক দিন আসবে, যাবার মুখে। এ আসা এমনি আসা। কিংবা হয়তো কিছু বলবার আছে। সুতপাও আসবে কি? সম্ভবতঃ না। সে আসবে সেই দিন, যেমন তাকেও গিয়ে দাঁড়াতে হবে ওদের বাড়ি, বন্ধুদম্পতির বিদায় ক্ষণে জানাতে হবে শুভেচ্ছা ও প্রীতিসম্ভাষণ।

বলা যায়না, সুতপাও এসে পড়তে পারে স্বামীর সঙ্গে, সেই আরেক দিন যেমন এসেছিল। দুটি হাতের যাদুস্পর্শে এক নিমেষে তার এই শোভাহীন, সজ্জাহীন ঘর দুখানির মধ্যে একটি স্নিগ্ধ শ্রী এনে দিয়েছিল।

সেদিনের কথা মনে হতেই নিলয় ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। চারদিকের অগোছালো মলিন রূপটা যেন

সহসা বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল। একবার ইচ্ছা হল, সেদিন যেমন করেছিল, চাকরটিকে ডেকে জিনিসপত্রগুলো একটু গোছগাছ করে রাখে। ডাকতে গিয়েও ডাকল না, ভিতর থেকে তেমন উৎসাহ পেলনা। শুধু জেনে নিল ঘরে চা এবং তার সরঞ্জামগুলো অর্থাৎ চিনি, দুধ, ষ্টোভের কেরোসিন ইত্যাদি সব ঠিক আছে কিনা। আছে জেনে আশ্বস্ত হল। প্রায়ই দেখা যায়, দরকারের সময় ওর কোনো না কোনোটার অভাব ঘটে এবং তার অদ্বিতীয় বাহনটিকে অসময়ে বাজারে ছুটতে হয়।

আফিস থেকে ফিরে ধড়াচূড়ো ছেড়ে নিলয় রোজ খানিকটা বেড়িয়ে আসে। আজ সুবীরের অপেক্ষায় বাড়িতেই রইল। বসবার ঘরের দরজাটা খুলে রেখে দিয়ে শোবার ঘরে ক্যাম্প চেয়ারে বসে একটা বাংলা মাসিকের পাতা ওলটাতে লাগল। সুবীর এলে উঠে যাবার দরকার নেই। সে সোজা ভিতরে চলে আসবে। তার খানিকটা দেরিও আছে। এই তো সবে বেরোল আফিস থেকে। সস্ত্রীক এলে আরো দেরি হবে। একটা তৈরী হবার পালা আছে। সেটা যত সাদাসিদে ভাবেই সারা হোক, কিছু সময় তো লাগবেই।

কিন্তু প্রত্যাশিত সময়ের বেশ কিছুটা আগেই বাইরের ঘরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, এবং সেটা আর অগ্রসর হল না। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে নিলয় চাকরটিকে ডেকে বলল, ছাখ তো কে ?

সে এক নজর দেখে ছুটে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, মেমসায়েব !

"মেমসায়েব !" বিস্ময়ের সুরে কথাটার পুনরুক্তি করল নিলয়, কিন্তু বুঝতে পারল না কোন্ মেমসাহেব, এবং এখানে তার কী প্রয়োজন থাকতে পারে। অগত্যা উঠে পড়তে হল। বসবার ঘরের ভিতরের দরজা পেরিয়েই একেবারে থ হয়ে গেল। অভ্যর্থনা দূরে থাক, নমস্কারের কথাটাও মনে পড়ল না।

মিসেস দত্ত নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসলেন এবং শুষ্ক গম্ভীর স্বরে বললেন, বসো নিলয়। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

এ কোন্ মিসেস দত্ত। এখানকার প্রতিটি মানুষ এতদিন দেখে এসেছে, তিনি যখন চলেন চারদিকে একটা হিল্লোল তুলে চলেন, যখন কথা বলেন তাঁর কণ্ঠ শুধু নয়, সারা অঙ্গ উচ্ছল হয়ে ওঠে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁকে বড় নিষ্প্রাণ বলে মনে হল। নিলয় আরো অবাক হল, বাইরে কোনো গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই, গাড়ির শব্দও সে পায়নি। সঙ্গে একটি বেয়ারা চাপরাশী কিংবা চাকর পর্যন্ত নেই। চীফ্ এঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী, স্বামীর চাইতেও যার দাপট বড়, এবং চালচলনের জাঁকজমক আরো বেশী, সন্ধ্যার অন্ধকারে একা একা পায়ে হেঁটে এসেছেন তাঁদেরই এক অধস্তন কর্মচারীর 'বি'মার্কা বাড়িতে! চোখের উপর দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত।

নিলয় কলের পুতুলের মত মনিব পত্নীর নির্দেশ পালন করল। দরজা বন্ধ করে জড়-সড় হয়ে সামনের চেয়ারে বসল এবং যে-'একটি কথা' তিনি বলতে এসেছেন, যার সম্বন্ধে কোনো ক্ষীণ-ধারণাও তার মনে এলনা, তারই জন্যে উৎকণ্ঠ হয়ে রইল।

মিসেস্ দত্ত দুমিনিট মাথা নিচু করে কী ভাবলেন, তারপর চোখ তুলে বললেন, ও-বাড়ি থেকে তোমার চলে আসার ব্যাপারে তুমি বোধহয় আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছ?

নিলয় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, না, না; সে কী কথা! —আমি অবিশ্যি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারতাম। তারপর ভাবলাম, তার দরকার নেই, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, নিজেই বুঝতে পারবে কেন তোমার নিজের কোয়ার্টাস্ ফেলে ওখানে পড়ে থাকা উচিত নয়। সে যাক। আজ একটা বিশেষ জরুরী কাজে তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে সেটা করে দিতে হবে, নিলয়।

শেষের দিকে এমন একটি অনুনয়ের সুর ছিল, যার উত্তরে কিছু না জেনেও নিলয়কে আশ্বাস দিতে হল—আজ্ঞে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব—

—"সম্ভব বৈ কি?" কথাটা যেন নিলয়ের মুখ থেকে কেড়ে নিলেন মিসেস দত্ত, "সম্ভব না হলে, এমন করে তোমার কাছে ছুটে আসতাম না। তবে, বুঝতেই পারছ, ব্যাপারটা এখানে একদম গোপন রাখতে হবে, এমন কি তোমাদের সি, ঈ পর্যন্ত জানতে পারবেন না।"

নিলয় ভিতরে ভিতরে একটু শঙ্কিত না হয়ে পারল না। কে জানে তাকে কোথায় নিয়ে চলেছেন মনিব-পত্নী?

মিসেস দত্ত ধীরে ধীরে বললেন, তুমি তো জান নিলয়, আমার একমাত্র সন্তান ঐ তপা। ওর আগে একটা ছেলে হয়েছিল, টিকলনা। ঐ মেয়েটাই আমার ছেলে মেয়ে সব। ওকে কাছছাড়া করতে পারবোনা বলেই সুবীরের বাবা-মার সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করেছি। ওঁদের প্রথম ছেলে, কত কষ্টে মানুষ করেছেন, ওর ওপরে একটা গোটা পরিবারের কত আশা-ভরসা, সব আমি জানি। জেনেও বাপ-মা ভাইবোনের কাছ থেকে ছেলেটাকে একরকম ছিনিয়ে নিয়েছি। সব ঐ তপার দিকে চেয়ে। ও যে আমার নিজের হাতে গড়া, এতটা বয়স পর্যন্ত নিজের মনের মত করে মানুষ করেছি। ওর বিয়ে দিতে হবে, ভাবতেই ভয় হয়েছে। কত রাত ঘুমোতে পারিনি। কার হাতে পড়বে, একটা কোন অচেনা সংসারে গিয়ে কার মুখ চেয়ে থাকবে, কেউ হয়তো ওর মনের দিকে তাকাবেনা, কখন কী চাই বুঝবেনা,—ও নিজেও কি তা বোঝে?—কষ্ট পাবে, কত অসুবিধা হবে, এই ছিল আমার ভাবনা। তাই, চেষ্টা করেছি, যেমন করে হোক ওকে নিজের কাছে রাখতে হবে, অন্ততঃ চোখের ওপর, আর যতটা পারি নিজের আওতার মধ্যে। তাই পেয়েছিলাম, তাই তো ছিল। কিন্তু কটা মাস না যেতেই—

মিসেস দত্তের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। হঠাৎ থেমে গেলেন। মিনিট কয়েক পরে আবার বললেন, ওরা চলে যাচ্ছে কেন তুমি বলতে পার? সুবীরের কাজকর্ম নিয়ে কী কোনো গোলমাল হয়েছে?

—না, না, গোলমাল কেন হবে?

—তবে?

—এর চেয়ে ভালো কাজ পেয়েছে বলেই যাচ্ছে।

—ও সব বাজে কথা। আসলে সুবীর যাচ্ছেনা, ওকে যাওয়াচ্ছে আমার ঐ মেয়ে, ঐ কালসাপ, যাকে আমি এতকাল ধরে দুধকলা দিয়ে পুষেছি।

নিলয়ের ইচ্ছা হল, সুতপার পক্ষ নিয়ে কিছু একটা বলে। কিন্তু মিসেস্ দত্তের চোখের দিকে চেয়ে সাহস হল না। তেমনি চুপ করে বসে রইল।

মিসেস পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করলেন। নিলয়ের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বললেন, তুমি তো সুবীরদের বাড়ি প্রায়ই যাও?

—আজ্ঞে হাঁ, মাঝে মাঝে যাই।

—ওর বাবা-মা তোমাকে খুব ভালবাসেন, শুনেছি। আর, নাই বা বাসবেন কেন? তোমার মত ছেলে! আসছে রবিবার,—না, অত দেরি করলে চলবেনা, কাল সকালের গাড়িতে চল আমি তোমার সঙ্গে ঘুরে আসি।

নিলয় চমকে উঠে চোখ তুলল, আপনি!

—হ্যাঁ, দোষ কী? কুটুমবাড়ি যাবো—

—কিন্তু—

—ভাবছ, সম্পর্কটা সেরকম নয়। ছেলে-বৌ যেখানে যেতে পারছেনা, সেখানে বেয়ান গিয়ে উঠবে কোন সুবাদে? অতশত ভাবতে গেলে এখন আর আমার চলেনা নিলয়। আর

যা-ই করুন, ওঁরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করবেন না।

—না, সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিন্তু আপনি যেটা চাইছেন, সে দিক দিয়ে ওঁরা কদ্দুর কী করতে পারবেন বুঝতে পারছিনা।

—কেন, সুবীরের বাবা যে-টাকাটা দিয়ে দিয়েছেন, সেটা ফিরিয়ে নেবেন। ও যেমন ছিল তেমনি থেকে যাবে। কোম্পানী এখনো তাকে রিলিজ করেনি। টাকা ফেরৎ নিতে চাইলে যাতে আপত্তি না করে, সেটা আমি দেখবো।

নিলয় আর কিছু বললনা। তার মনের মধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো ভাবনা ভিড় করে এল। বুঝতে পারল, সে যতটা অনুমান করেছিল, ব্যাপারটা এরই মধ্যে তার চেয়ে আরো বেশী জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে সাবধান হয়ে মুখ খুলতে হবে। কিছু একটা করবার আগে আরো সতর্ক হয়ে এগোতে হবে। এই মহিলাটিকে শুধু যে আসল বিষয়ে অজ্ঞ রাখা হয়েছে, তাই নয়, কিছু কিছু মিথ্যা খবরও দেওয়া হয়েছে।

নিলয়কে চুপ করে যেতে দেখে মিসেস তাঁর নিজের প্রস্তাবটা আর একটু খোলসা করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, সুবীরের বাবা যে ভুল করছেন সেটাই আমি তাঁকে বুঝিয়ে দেবো। ছেলেকে যদি নিজের কাছে নিয়ে ওঁর ফ্যাক্টরীর কাজে লাগাতে চান, আমি আর বাধা দেবোনা। কিন্তু তার জন্যে তাকে আরো কিছুদিন এখানে রেখে দেওয়া দরকার। তা না করে এ কী করছেন তিনি? বম্বেতে সে কী করবে? তাঁর ছেলেকে আমি তাঁর চেয়েও বেশী চিনি। ওর মাথার ওপর কেউ না থাকলে ও যে কিছু করতে পারবে, সে ভরসা খুবই কম। সে কি তুমিও জান না?

নিলয়ের পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব নয়। 'হাঁ' 'না' একটা কিছু বলতে হবে। হয় মনিব-জায়ার আদেশ মত তাঁকে নিয়ে পরদিনই

বিশ্বাস করুন, আপনি যা বলছেন ওরকম কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। সুবীর আমার বন্ধু, তার দরকারের সময় টাকাটা ধার দিয়ে যদি একটু—

বলতে বলতে থেমে গেল এবং বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল তার মনিব-গৃহিণীর দিকে।

দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েই মিসেস দত্ত থমকে দাঁড়ালেন। হঠাৎ কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। শক্ত ঋজু ঘাড়টা নিচে নেমে এল, শিরদাঁড়াটাও যেন নুইয়ে পড়ল সামনের দিকে। পিছন ফিরে তাকালেন না। শান্ত-করুণ কণ্ঠে বললেন, তুমি কিছু মনে করোনা। তোমার কোনো দোষ নেই। পেটের মেয়েই যখন পর হয়ে গেল, তখন—

পরের কথাগুলো আর শোনা গেলনা। হয়তো সেগুলো রুদ্ধ কণ্ঠের অন্তরালেই রয়ে গেল।

নিলয়ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের সামনে তেমনি অবনত শিরে ধীর পদক্ষেপে রাস্তায় নেমে পড়লেন মিসেস দত্ত, এবং সর্বদেহে যেন একরাশ পরাজয়ের গ্লানি বয়ে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

॥ দশ ॥

সুহৃদ সাধারণত ছটায় ফেরেন। আজ খানিকটা আগেই এসে পড়লেন। উপরে যখন উঠলেন, অন্য দিন মুখে যে মালিন্য ও ক্লান্তির ছাপ পড়ে তার বদলে বেশ খানিকটা ঔজ্জ্বল্যের আভাস। মালতীর চোখে কিছুই এড়ায় না। স্বামীর দিকে চেয়ে খুশির সুরে বললেন, এত সকাল সকাল যে?

সুহৃদ জামা ছাড়তে ছাড়তে বললেন, একটু আগে আগে বেরিয়ে ডক্টর ধরের কাছে গিয়েছিলাম।

মালতীর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল, "কেন, আবার ডাক্তারের কাছে কেন?"

সুহৃদ হেসে উঠলেন, সে ডাক্তার নয়, সুনুর প্রফেসর ডক্টর ধর।

ছাখ দিকিনি কাণ্ড! আমার কি অত খেয়াল আছে? ডাক্তার শুনেই ভয় পেয়ে গেয়েছিলাম। সেখানে কেন?

বলে এলাম, আপনার ছাত্রটিকে এবার ডেকে নিন, আমার আর তাকে দরকার নেই।

উনি কী বললেন?

খুব খুশী হলেন শুনে। চমৎকার লোক, মনটা একেবারে শিশুর মতো। সুনুকে ভীষণ ভালোবাসেন দেখলাম। যে-কটা মিনিট ছিলাম, শুধু ওরই কথা—এমন ছেলে হয় না, যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি পরিশ্রমী, একদিন অনেক বড় হবে।

রিসার্চটা হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ায় মনে মনে বড় দুঃখ পেয়েছিলেন ভদ্রলোক।

পুত্রগর্বে মালতীর বুকখানা ভরে উঠল। গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ছাখ, ওকে দিয়ে যদি বংশের মুখটা থাকে।

ঐ সঙ্গে আরেকটা খবর দিলেন ডক্টর ধর।

কী?

ওঁকে অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি থেকে বারবার ডাকাডাকি করছে। ওখানকার ইংরেজির চেয়ার। এখানে যে কাজে আছেন, তার চেয়ে বড় পোস্ট, মাইনেও বেশ কিছুটা বেশী। বললেন, 'আমার যাবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধহয় এড়ানো যাবে না। যদি যাই সুনীতকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। অসুবিধে কিছু নেই, আমি তো একা মানুষ, আমার বাড়ীতেই থাকবে। ওখান থেকে একটা স্টাইপেণ্ডও পাইয়ে দিতে পারবো।'

মালতীর বুকটা ধক্ করে উঠল—এ ছেলেটাও দূরে চলে যাবে! সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝলেন, আটকানো যাবে না, সেটা উচিতও নয়। এ রকম সুযোগ কজনের ভাগ্যে জোটে? ও বড় হোক, মানুষ হোক। অন্ধ্র আর এমন কি দূর? ছুটি-ছাটায় আসতে পারবে।

এবার আসল কথায় এলেন মালতী। ছেলের রোজগার—তা সে যত সামান্যই হোক—একেবারে বাদ পড়লে স্বামীর উপরে আবার বেশী চাপ পড়বে না তো? সে বিষয়ে সুহৃদ যা বললেন, সত্যিই সুখবর। পরপর গোটা কয়েক ভালো অর্ডার ঠিকমত সাপ্লাই দেবার পর ফার্ম বেশ ভালোভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, বাজারে নামও হয়েছে। আয় যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা বহাল তো থাকবেই, ক্রমশ বাড়বে বলেই ভরসা পাওয়া যাচ্ছে। সচ্ছলভাবে সংসার চালিয়ে মূলধনটাকে আস্তে আস্তে বাড়ানো চলবে। কোন কোন অংশে কিছুটা করে কাজ বাড়াতে পারলে, আরো ভালো হতো। তবে তার পিছনে খাটনিও চাই তেমনি।

"কোন দরকার নেই," বেশ জোর দিয়ে বললেন মালতী, "এই আমাদের যথেষ্ট। এমনিতেই কি কম খাটনি গেল? একদিন নয়, দুদিন নয়, পুরো তিনটে বছর। আর এখন? এখনো তো

কোন আরামের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। কাজ তো বোধহয় বেড়েই চলল।

কাজে আমার কোন কষ্ট নেই, মালতী, যদি তার ফল সম্বন্ধে একটা নিশ্চয়তা থাকে। এতদিন সেটা ছিল না বলেই অত শীগগির ক্লান্তি এসে যেত, মনে হতো শরীর আর বইছে না। আসলে ওটা দেহের নয়, মনের অবসাদ।

'সে কথা সত্যি। তবু মানুষের শরীর তো, তাকে বিশ্রাম না দিলে চলে?'—বলে, এক মুহূর্ত কী ভাবলেন মালতী, তারপর বললেন, এই সময়ে যদি বড় ছেলেটা কাছে থাকত? কী লাভ হলো তাকে শিবপুরে পড়িয়ে? তৈরী হয়ে আজ পাশে এসে দাঁড়াবে, এই আশা করেই না এতগুলো টাকা ঢেলেছিলে তার পিছনে? তখন কি জানতে সবটাই শুধু ভস্মে ঘি ঢালা?

পাশে এসে দাঁড়াবে, সে আশা অবশ্যই ছিল। শুধু তাই নয়, ভেবে রেখেছিলাম, গোড়া থেকেই ওকে পার্টনার করে নেবো, যাতে করে কাজে উৎসাহ আসে, দায়িত্ব বাড়ে। তা হলো না। না হলেও দাঁড়িয়ে গেছে, এতেই আমি সুখী।

একটু থেমে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কথাটাও বুঝি। শিবপুরের খরচ যোগাতে সেদিন কত জায়গায় টান পড়েছে, কত কাণ্ড করে তোমাকে সব দিক সামলাতে হয়েছে, সব না জানলেও কিছু কিছু জানি। তবু চলে তো গেছে। সেইটাই বড় কথা। সেদিনের কথা ভেবে মনে আমার কোন ক্ষোভ নেই। তুমিও রেখো না।

ক্ষোভ রাখব না বললেই কি মন থেকে তাকে দূর করে দেওয়া যায়? মালতী অন্তত তা পারেন না। স্বামীর মনের ঐ উদার বিস্তৃতি তার নেই। তবু এ নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না। চায়ের আয়োজনে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

সুনীত এসে রীতিমত লাফাতে শুরু করল। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের

ব্যাপারটা আরো লোভনীয়। সবাইকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে হবে, কিন্তু সে আর কতদিন? আর সাত-আট মাস খাটলেই তার থিসিস তৈরী হয়ে যাবে। চাকরি পাবার পরেও সে বসে ছিল না। যতটা সম্ভব কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

ঐদিনই ছুটছিল ডক্টর ধরের বাড়িতে। মালতী বাধা দিলেন, এখন কোথায় যাবি? কাল কলেজ করে ওখান থেকে চলে যাস।

শিখা বি-কম পাশ করে বসে ছিল। ফার্স্ট ক্লাশ অবশ্য পায় নি। তবে সেকেণ্ড ক্লাশের উপরের দিকেই স্থান পেয়েছিল। তার চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যান্সি ব্যাপারটা কিছুই এগোয়নি। বাবার উপর চাপ পড়বে বলে সেও পীড়াপীড়ি করেনি। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে সে কিছুতেই রাগ চাপতে পারত না। ওর এই ইচ্ছাটাকে কেউ যেন বিশেষ আমল দিচ্ছিল না। মা মুখ টিপে হাসেন, ছোড়দার মুখে তো ঠাট্টা ছাড়া কিছু নেই। নিলয়ের কাছ থেকে খানিকটা উৎসাহ পাবে বলে মনে করেছিল। ওমা! সব সমান! সে যখন তার সমস্ত পরিকল্পনাটা আগাগোড়া বুঝিয়ে দিল, মনে হলো বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছে বুঝি। কোথায়? চোখ দেখেই বোঝা গেল, কিচ্ছু শোনেনি, শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অতক্ষণ ধরে তার বকে মরাই সার হলো। তাড়া দিতেই যেন চমক ভাঙল। এদিকে চালাক আছে। তখনই সামলে নিয়ে বলল, কী বলছিলে? চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যান্সি? কী লাভ হবে? শেষ পর্যন্ত চীফ্ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্। তার চেয়ে এক কাজ কর। বিজ্‌নেস্ ম্যানেজমেণ্ট পড়। বছর কয়েক পরেই একেবারে জেনারেল ম্যানেজার।

ধেৎ, বলে রাগ করে চলে গিয়েছিল শিখা। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল আরশির সামনে। সেই চোখ দুটো যেন তখনো তাকে অনুসরণ করছিল, তার সারা অঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটি মোহময় দৃষ্টি-স্পর্শ।

চেতনার মধ্যেও এক অদ্ভুত অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছিল। অনেকক্ষণ সে বাইরে আসতে পারেনি। কোথা থেকে এক গোপন, মধুর লজ্জার রক্তিমা সারা গণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারই অলক্ষ্য পাশ পা দুটোকেও যেন অচল করে দিয়েছিল।

পরের দিনটাও থেকে গিয়েছিল নিলয়। কিন্তু শিখা একবারও তার সামনে আসতে পারেনি।

সুনীত কলেজে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে, একমাস পেরোলেই চাকরি ছেড়ে রিসার্চের কাজে ফিরে যাবে। আপাতত কোলকাতায়, তারপর আবার অন্ধ্র-যাত্রার আয়োজন। সেই সবই এখন ভাবছে সবাই, শিখারও যে একটা ব্যাপার আছে, সে কথা যেন কারো মনেই নেই। কয়েকদিন ধরে সংসারের ভাবগতিক সে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখল। তার পর একটা সুযোগ বুঝে সোজা চলে গেল বাবার কাছে। তিনি কী সব কাগজপত্র দেখছিলেন। ওকে বোধহয় লক্ষ্য করলেন না। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ডাকল, বাবা।

কে, খুকু? কী খবর মা-মণি?

আসছে সেশনে আমাকে ভর্তি করে দিচ্ছ তো?

কোথায়?

ও মা! তাও ভুলে গেছ? তা যাবে বৈকি? আমি তো আর ছেলে নই, মেয়ে। মেয়ের কথা কে ভাবে?

সুহৃদ হাসলেন। কাগজগুলোর উপরে একটা কাঁচের চাপান বসিয়ে দিয়ে মুখ তুলে বললেন, মেয়ের ভাবনাই তো সব চেয়ে বড় ভাবনা। হচ্ছে, হচ্ছে; তোমার ভর্তির বন্দোবস্ত করাই এখন আমার প্রথম কাজ।

আর কিন্তু মোটে দু মাস আছে কোর্স শুরু হতে।

"দু মাস?" দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন সুহৃদ, "দু মাসের মধ্যে কি পেরে উঠবো?"

বাবার কথাগুলোর মধ্যে যে নিগূঢ় ইঙ্গিত ছিল, শিখা সেটা শুরুতেই ধরতে পেরেছিল। কিন্তু ধরতে পেরেছে এটা যদি বাবার কাছে ধরা পড়ে যায়, লজ্জার আর সীমা থাকবে না। তাই ইচ্ছা করেই বোকা সাজতে হলো। বলল, বাঃ, তাহলে কী করে হবে? সেশন পেরিয়ে গেলে আবার এক বছর!

না, না; অত দেরি হবে না। তার আগেই ব্যবস্থা করে ফেলবো।

গলায় রীতিমত গাম্ভীর্য আনবার চেষ্টা করলেন সুহৃদ, কিন্তু মুখের হাসিটি লেগে রইল।

এরপরেও না-বোঝার ভান করা শিখার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। এমন সময়ে মা এসে তাকে তখনকার মত বাঁচিয়ে দিলেন। ঘরে ঢুকেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কী?

বাঃ, আমার বুঝি কিছু বলবার নেই? আমি পড়বো না? সেই কবে থেকে বাড়ি বসে আছি।

তুই আবার কী পড়বি? এম. এ.?

এম. এ. পড়ে কী হবে?

ও, তোমার সেই চার্টার, না ফার্টার! কী যে সব মাথায় ঢোকে! তুমি ওকে বেশ করে বুঝিয়ে দাও দিকিন, ও-সব জিনিস মেয়েদের জন্যে নয়।

কে বললে মেয়েদের জন্যে নয়? কত মেয়ে পড়ছে আজকাল।

"বেশতো," মেয়েকে আশ্বাস দিলেন সুহৃদ, "চার্টার কথাটার অর্থ হল সনদ। তোমার জন্যে পাকা সনদের ব্যবস্থা হচ্ছে। তার মধ্যে কিছু অ্যাকাউন্ট্যান্‌সিও থাকবে বৈকি? তোমার মাকে দেখছো না? কী রকম পাকা অ্যাকাউন্ট্যান্ট্। তা না হলে তোমাদের সংসার কবে অচল হয়ে যেত।"

এ কথাগুলো এত স্পষ্ট যে উত্তরে কিছু বলতে গেলেই অজ্ঞতার মুখোশ খুলে পড়ে যাবে। মালতী বোধহয় সেটা বুঝতে পারলেন। বললেন, আচ্ছা তুই এখন সরে পড়। আমার কয়েকটা দরকারী কথা আছে।

কী করে যেন শিখার মনে হল, 'দরকারী' কথাটা বোধহয় তারই সম্পর্কে, এবং এমন একটা বিষয়ে, যার দুর্বার প্রলোভন ত্যাগ করে চলে যাওয়া বড় কঠিন। অথচ প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে কান পাতাও অসম্ভব। তাই চটি জোড়ায় একটা অস্বাভাবিক শব্দ তুলে একেবারে ওদিকটায় তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকতে হলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-দুটো ফেলে রেখে সকলের অলক্ষ্যে সন্তর্পণে এসে দাঁড়াতে হলো, বাবা-মা যে ঘরে বসে কথা বলছেন, তার ঠিক পাশের কামরায়। সেটির মালিক সুনীত, আপাতত অনুপস্থিত। দুটি ঘরের মাঝখানে একটি দরজা আছে, দুদিক থেকে বন্ধ। কপাটের ফাঁকে একটি কান রাখলেই যথেষ্ট। দুজনের সব কথা সোজা এসে ঢুকে যাবে।

চটি খুলে ফিরে আসা পর্যন্ত যে কটি কথা হয়ে গেছে তা অবশ্য শোনা গেল না। তাতে যে বিশেষ লোকসান হয়নি, পরের কথাতেই বোঝা গেল। বাবা বলছেন, খুকুর ওকে পছন্দ হয়েছে তো?

কেন, অপছন্দের কী আছে? ঐ রকম হীরের টুকরো ছেলে!—মায়ের কথায় বেশ খানিকটা ঝাঁজ।

বাবা বললেন, তা হলেও জেনে নেওয়া ভালো। মেয়ে বড় হয়েছে, লেখা পড়া শিখেছে, তার একটা নিজস্ব মতামত আছে।

তা আছে বই কি? তবে সব জিনিস কি আর মুখ ফুটে বলে মেয়েরা? হাব-ভাব থেকে ধরে নিতে হয়। সে-সব ঠিক আছে।

ব্যস্, তাহলেই হল। ও কবে নাগাদ আসবে বলে গেছে?

তা কিছু বলেনি। বোনের হঠাৎ বিধবা হওয়ার খবর পেয়ে পাকিস্তানে গেছে তাকে নিয়ে আসতে। খুড়তোতো বোন। কাকা লিখেছেন, তুমি ছাড়া আর কে যাবে? ওখানকার একটা ব্যবস্থা করে বোনকে কাকার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে।...কী আশ্চর্য ছেলে! এই কাকাই ওদের সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে ওকে আর ওর মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

একটা মস্ত বড় প্রাণ আছে ছেলেটির মধ্যে। এদিকে কাজে কর্মেও পুরো প্র্যাকটিক্যাল। আমার দু-একটা ব্যাপারে দেখেছি তো। সবদিকে হুঁসিয়ার, ভালো এঞ্জিনিয়ার হতে হলে যে গুণটি সকলের আগে দরকার।

এক কাজ কর না কেন? বিয়ের পর ওখানকার চাকরি ছাড়িয়ে এনে তোমার এখানে লাগিয়ে দাও। তুমি তাহলে একটু জিরিয়ে নিতে পার।

তা হয় না। জামাই জামাই! তার সঙ্গে বিজ্‌নেস্‌-সম্পর্ক করতে গেলে অনেক রকম জটিলতা এসে পড়ে। তাতে দু তরফেই অশান্তি দেখা দিতে পারে।

মিনিট দুয়েক দুজনেই চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বাবার কথাই শুনতে পেল শিখা—আমার কী মনে হয় জানো? বিয়ে দেবার পর মেয়েকে কাছে টেনে রাখতে যাওয়া মানে তাকে ক্রমশ দূরে ঠেলে দেওয়া। তার চেয়ে দূরে যেতে দিলেই বরং তাকে কাছে পাওয়া যায়। সিঁথিতে সিন্দুর উঠলেই সে আর মেয়ে নয়, স্ত্রী, বধূ। তখন সেই ভাবেই তাকে দেখতে হবে। আর দেখতে হবে, তার এই পরিণতির পথটা যেন সুগম হয়, অন্তত আমরা যেন সেখানে কোনো বাধা সৃষ্টি না করি।

বাবার কথাগুলো তন্ময় হয়ে শুনছিল শিখা। বোধহয় মাও তাই। অনেকক্ষণ তাঁর গলা পায়নি। ও নিজেও একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ আবার যখন কান দিল ও দিকটায়, মনে

হয় ওঁরা অন্য কোনো প্রসঙ্গে চলে গেছেন। আর দাঁড়াল না। এবার একবার নিজের মুখোমুখি গিয়ে বসতে হবে। নিজের মধ্যেই অনেক কথা জমে উঠেছে।

খাবার ঘরের ঠিক লাগোয়া, তার ঘরখানা খুব ছোট। নড়তে-চড়তে বাধে। তার জন্যে মাঝে মাঝে বড় অসুবিধা বোধ করে। এই মুহূর্তে মনে হল, এই ছোট ঘরের যেন একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। মন যখন ভরে থাকে, তখন চারদিকের বিস্তৃতি ভাল লাগে না। তখনকার জন্যে প্রয়োজন এই রকম একটি ছোট্ট আবেষ্টন, যার মধ্যে বসে নিজের ভিতরটাকে ইচ্ছামত ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

জানালার নিচে যে উঁচু জায়গাটুকু সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো, তারই উপর গিয়ে হাঁটু তুলে বসল শিখা। ডান হাতে একটা শিক ধরে চোখ দুটি পাঠিয়ে দিল বাইরে, খোলা আকাশের কোলে। চলে গেল দূর থেকে দূরান্তরে।

বাবার কথাগুলোকে আশ্রয় করে অবাধ কল্পনা দিয়ে গড়ে তুলল একটি সুখ-নীড়, বাংলা দেশের বাইরে কোনো পাহাড়ের কোলে, যার বুক চিরে বয়ে গেছে একটি আঁকাবাঁকা জলধারা, শীতের দিনে শীর্ণ মন্থর, বর্ষায় স্ফীত, চঞ্চল, উচ্ছ্বসিত। তখন তার নাম নদী। সেই নদীর ওপারে কিছুটা দূরেই সহর। নতুন গড়ে উঠেছে, স্বাধীনতার পর। নতুন নতুন কল কারখানা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তারই একটাতে কাজ করছে নিলয়—সুদক্ষ, কর্মঠ এঞ্জিনিয়ার, নব ভারতের দ্রুত শিল্পায়নে নিয়োজিত সার্থক স্থপতি।

সে নিজেও একটা কিছু করবে। শ্রমিক বসতির মেয়েদের সেলাই শেখাবে, ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল চালাবে। যা-ই করুক বিকেল বেলা তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। গা ধুয়ে, চুল বেঁধে বাগানে গেটের ধারে গিয়ে দাঁড়াবে নিলয়ের ফেরার অপেক্ষায়। তার হাত

থেকে টুপিটা নিয়ে নেবে, হাত মুখ ধোবার জন্যে তাড়া দেবে, চায়ের টেবিলে নিজের হাতের তৈরী দু-একটি মুখরোচক খাবার দিয়ে তাকে চমকে দেবে, মা যেমন দেয় বাবাকে।

তারপর দুজনে মিলে বেড়াতে যাবে পাহাড়ী পথের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অনেক দূরে।

॥ এগার ॥

ডক্টর ধর অন্ধ্রকে এড়াতে পারলেন না। মাস কয়েকের মধ্যেই চলে যেতে হলো। প্রথমে ঠিক ছিল, ওখানে গিয়ে বসে কিছুটা গোছগাছ করে নিয়ে, তারপর সুনীতকে যেতে লিখবেন। ওর রিসার্চ এবং স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা অবশ্য কোলকাতা থেকে চিঠি-পত্রেই করে নিয়েছিলেন। অধ্যাপকের রওনা হবার কয়েক দিন আগে সুনীতই অগ্রণী হয়ে বন্দোবস্তটা পালটে দিল। মাকে বোঝাল, যাওয়া যখন স্থির, মিছিমিছি দেরি করে কী লাভ। এক সঙ্গে গেলে আমারও খানিকটা কাজ এগিয়ে যাবে, ওঁরও অনেক সুবিধা। একা মানুষ, বয়স হয়েছে, এখানে যে লোকটা দেখাশুনো করত সেও যেতে পারছে না। উনি একেবারে আতান্তরে পড়ে যাবেন। একেই তো যখন পড়াশুনো নিয়ে থাকেন, সময়ের জ্ঞান থাকে না, খাওয়া হয়েছে কিনা, তাও ভুলে যান।

ছেলের মুখে তার এই পরম প্রিয় অধ্যাপকটির কথা অনেক শুনেছেন মালতী। ভদ্রলোককে কখনো দেখেননি, শুধু শুনে শুনেই মনের মধ্যে তাঁর জন্যে একটি গভীর শ্রদ্ধার আসন রচিত হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে অনেকখানি মমত্ববোধ। কত বড় পণ্ডিত, দেশ-বিদেশে কত নাম, কত যশ, অথচ সে সম্বন্ধে এতটুকু অভিমান নেই। শিশুর মত সরল। প্রচুর রোজগার করেন, সব দান-ধ্যানে চলে যায়। বিয়ে-থা করেননি, নিরামিষ খান, পোশাক-আসাক অতি সাধারণ। পুরোপুরি সন্ন্যাসীর জীবন। সুহৃদও বলেছিলেন, দেখলে সত্যিই ভক্তি হয়।

মালতী সুনীতের প্রস্তাবে মনে মনে সায় না দিয়ে পারলেন না, যদিও মুখে বললেন, তোমাকে কে দেখে তার ঠিক নেই, তুমি আবার তাঁকে দেখবে!

তুমি পাত্তা না দিলে কী হবে, স্যর আমার ম্যানেজমেন্টের খুব তারিফ করেন।

তুমি ওঁর ম্যানেজার বুঝি?

শুধু ম্যানেজার? মাঝে মাঝে চাকরের রোলেও নামতে হয়।

চাকরের রোল! এবার রীতিমত বিস্মিত হলেন মালতী

শিখা কোথায় কী একটা করছিল, গল্পের গন্ধে বসল এসে মায়ের পাশে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করল, ঠিক রোলই পেয়েছ।

শোন্না কী মজার ব্যাপার। বই ছাড়া স্যরের আর একটা নেশা আছে—কফি। লাইব্রেরিতে বসে পড়ছেন, হঠাৎ হাঁক দিলেন. বাঞ্ছা! বাঞ্ছারাম হয়তো তখন হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। আমি পাশের ঘরে কাজ করছি। গলাটা যদ্দুর পারি বাঞ্ছার মত করে সাড়া দিলাম, যাই বাবু! হুকুম হলো, এক কাপ কফি নিয়ে আয়।

কিচেনে গিয়ে কফি তৈরি করলাম।

তুই জানিস নাকি কফি করতে?

প্রাণের দায়ে জানতে হয়েছে। নেশা তো। না পেলে ওঁর পড়াশুনো তো লাটে উঠবেই, আমারও সব কাজ পণ্ড।

আচ্ছা, কফি তো করলে; তারপর?—শিখার আর দেরি সইছে না

তারপর খালি পায়ে, আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে, খোলা বইয়ের ঠিক পাশটিতে কাপটা বসিয়ে :দিয়েই পিট্টান।

শিখা হেসে গড়িয়ে গেল। মালতী বললেন, যদি দেখে ফেলতেন, কে?

কী করে দেখবেন? চোখ দুটো তো বইয়ের পাতায়।

সুনীতের-বাক্স পেটরা সাজানো-গোছানো, বাঁধা-ছাঁদা বেশির ভাগ শিখাই করে দিল। তাকে তো বাইরে বাইরেই ঘুরতে হচ্ছে। ওদিকে মা রান্না ভাঁড়ার সংসার নিয়ে ব্যস্ত।

একা একা ট্রাঙ্কে, সুটকেসে এটা সেটা ভরতে ভরতে শিখার মনের মধ্যে একটি গোপন আনন্দের মধুর সুর বাজতে থাকে। এমনি করে তাকেও সব সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে হবে। সেদিনটিও এলো বলে। মনটা এক ফাঁকে চলে যায় নিলয়ের কাছে। ভারী রাগ হয় তার উপর—কেন এত দেরি করছে আসতে। ঐ এক রকমের মানুষ, ছেলেবেলা থেকে শুধু পরের বোঝা বয়ে বয়েই এত বড় হলো। কার কোথায় কী সমস্যা দেখা দিয়েছে, কে কোন্ বিপদে পড়েছে, অমনি ছোট সেখানে। কত বাজে লোক, পাজী লোক যে ঘাড়ে চেপে আছে, তার সীমা নেই। আচ্ছা, সেও দেখে নেবে কত দিন থাকে, কতদিন এমন খাটিয়ে নেবার সুবিধে পায়।

সুনীত যেদিন রওনা হবে, তার আগের দিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মালতী তার ঘরের সামনে এসে ডাকলেন, সুনু ঘুমোলি?

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এলো, না, না, এখনি ঘুমবো কি?

শুয়ে ছিল, উঠে এসে আলো জ্বেলে দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, এস মা। তোমার কাজকম্ম মিটল?

কোনো রকমে মিটিয়ে এলাম। তুই বোস, তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

সুনীতের বুকটা হঠাৎ নড়ে উঠল। মার সঙ্গে তার কত কথা হয়, কিন্তু ঠিক এই সুর তো কখনো শোনেনি। তার গলাতেও গাম্ভীর্যের স্পর্শ লাগল।

কী কথা মা?

অঞ্জলিকে তো তুই দেখেছিস।

কে অঞ্জলি ?

ঐ যে বিশ্বনাথবাবুর মেয়ে।

ও, তা দেখেছি বৈকি ? প্রায়ই তো দেখা হয়, তবে কথাবার্তা বড় একটা হয় না। যেন কি রকম কি রকম ; ভয় পায়, না লজ্জা পায় ঠিক বুঝি না।

না না, ভয় পাবে কেন ? মেয়েটা বড় লাজুক, আর ভারী নরম। দেখতেই বা মন্দ কী ? গেরস্ত ঘরে যেমন হয়ে থাকে ; স্বভাবটি একেবারে মাটির মতো।

অর্থাৎ তোমার ঐ রূপসী কন্যার মতো খরখরে নয়।

রূপসী কন্যা একবার শুনলে হয় ! সে যাক ; তোর কেমন লাগে ?

মন্দ লাগবার তো কোন কারণ নেই।

মালতী একটু খানিক ভেবে নিয়ে বললেন, ছাখ, ওঁদের একান্ত ইচ্ছা, মেয়েটি আমাদের ঘরে আসে। সেই আশায় ওর বাপ ওকে আবার পড়াচ্ছেন। ওরও খুব উৎসাহ পড়াশুনোয়। মাঝখানে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। এবার আই-এ পরীক্ষা দিয়েছে, পাশও করে যাবে। কাজকম্মে ওর তুলনা নেই। মেয়েটাকে আমার বড় ভালো লেগেছে, সুনু। তুই যদি বলিস, ওদের কথা দিই। তোর বাবারও পছন্দ হয়েছে ; শুধু তুই মত করলেই হয়।

সুনীত খুব গম্ভীর হয়ে গেল, সাধারণত যা সে হয় না। মায়ের কথা শেষ হবার পরেও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, মা। কিছু মনে করবে না তো ?

না না, মনে করবো কী ?

পুব অঞ্চলে, মানে ঢাকা ফরিদপুর ঐ সব জায়গায় চাষীদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে—আগের হাল যেদিক যায়, পিছের হালও সেদিক যায়। তুমি কি সেই ভয় করছ ?

এই তোকে ছুঁয়ে বলছি, সুনু, সে কথা ভেবে আমি বলিনি। তোকে দিয়ে আমার কোনো ভয় নেই। তুই যা-ই করিস, আমাদের কখনো আঘাত দিবি না, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি কী ভাবছিলাম জানিস? তুই কত দূর চলে যাচ্ছিস, কবে আসবি, কোথায় থাকবি কিছুই ঠিক নেই। খুকুটার বিয়ে হয়ে যাবে, ইনি সারাদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আমি কী নিয়ে থাকবো? ঘরগুলো সব খাঁ খাঁ করবে, ভাবতেই আমার ভয় করছে। তাছাড়া—

একটুখানি বিরাম। তারপর আবার বললেন, মায়ের মন তো; কত কথা ভাবে। সেই কবে থেকে আশা করে আছি, দুটি বৌ আসবে আমার। একটিকে দিয়ে তো সব সাধ মিটল! আরেকটি আবার কেমন হবে······

মালতীর মৃদু স্বর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সুনীত বলল, তুমি যে আমাকে ভীষণ বিপদে ফেললে মা। বিয়ের কথা আমি একেবারেই ভাবিনি। এখন থেকে বেশ কয়েক বছর ভাববার অবসরও হবে না।

বেশ তো। আজই তোকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে, এমন কথা বলেছি নাকি? আর এখ্খনি যদি মত দিতে না পারিস, তাতেও ক্ষতি নেই। কাল রাত নটায় তোর গাড়ি। সারাদিনে যখন ইচ্ছা, মেয়েটিকে একবার ছাখ, কথাবার্তা বল। যদি পছন্দ হয়, ওরা অপেক্ষা করবে।

সুনীত এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। মনে হল, মা তার কাছে বড় বেশী প্রত্যাশা করছেন। বিয়েটা কি এমন জিনিস যে একদিনের মধ্যেই তার সম্বন্ধে মন স্থির করা যায়? বিশেষ করে, এখনো তার চিন্তার পাল্লায় ঐ দুটি শব্দ কোথাও ধরা দেয় নি। অনাগত জীবনের যতখানি নিয়ে মনে মনে ছক এঁকে রেখেছে, তার কোনোখানে ওটি স্থান পায়নি। কিন্তু এসব কথা মাকে বোঝানো যাবে না। তাঁর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ আলাদা পথ বেয়ে

চলেছে। অনেকটা নিজের এবং নিজের গড়া তাঁর এই সংসারের কথাই ভাবছেন তিনি। যে আঘাত তিনি পেয়েছেন, সেদিক দিয়ে দেখলে এ জন্মে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তাই মাকে সরাসরি নিরাশ না করে বলল, আচ্ছা, তুমি এখন শুয়ে পড়গে। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

মালতী তাঁর শিক্ষিত দায়িত্বশীল ছেলের কাছ থেকে এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশী কোনো আশ্বাস আশা কবতে পারেননি। এইটুকুতেই মনে মনে খুশী হয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

পবদিনেব প্রায় সবটাই সুনীত কাজের অজুহাতে বাইরে বাইরে কাটাল। বাড়িতে যতক্ষণ রইল, এমন একটা ব্যস্ততার ভাব দেখাল, যে মালতী মেয়েটিকে একবারও ডেকে পাঠাবার সুযোগ করতে পারলেন না। মায়ের সঙ্গে এই ছলনা সুনীতের মনকে পীড়া দিচ্ছিল। কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় কী? যাবার সময তাঁকে একটা আঘাত দিয়ে না যেতে হয়, এই একটি মাত্র কথাই সে ভাবছিল।

আর একজনের কথা সে একবারও ভাবেনি। এই বাড়িরই নিচের তলায় কোনো এক নিরালা ঘরের কোণে একটি নীরব মেয়ে সমস্ত দিন ধরে দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিল, কখন তার ডাক পড়বে, কখন গিয়ে দাঁড়াতে হবে তার জীবনের চরম পরীক্ষার মুখোমুখি। এই তুচ্ছ খবরটুকু উপরে গিয়ে পৌঁছায়নি। সে জানত, সে অতি সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে। তার বাবা মা তাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখছেন, সবটাই আকাশকুসুম। যে মানুষটির একান্ত পাশটিতে নিয়ে তাকে দাঁড় করাতে চাইছেন, তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতাও তার নেই। কিন্তু মানুষের মন, বিশেষ করে কুমারী-মন কি কোনোদিন যুক্তির পথ ধরে চলে? বাবা-মার যে দুরন্ত আশা, মেয়ের মনেও কখন তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। হয়তো তারই টানে রাত আটটার সময় সে

সকলের অগোচরে রাস্তার ধারের একটি অন্ধকার নির্জন ঘরের রুদ্ধ জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে। তাই নিয়ে ছুটোছুটি। এবাড়ির উপরে নিচে কারো আসতে বাকী নেই, বাইরে থেকেও কেউ কেউ এসে পৌঁছেছেন। শুধু একজন সেখানে অনুপস্থিত।

যার গৌরবময় প্রবাস-যাত্রা উপলক্ষ করে আজকের এই চঞ্চলতা, সে যখন একে একে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল, সেই একজন যে খড়খড়ির ভিতর দিয়ে ভীরু অপলক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, সে কথা সে জানতে পারল না, হয়তো কোনোদিনই পারবে না।

॥ বার ॥

নিলয়ের ফিরতে বেশ দেরি হলো। এই বোনটিকে সে কেবল কাকার মেয়ে হিসেবে কোনোদিন দেখেনি। ওরা প্রায় সমবয়সী। যখন ছোট ছিল, একসঙ্গে খেলা-ধুলো করেছে। ওকে আর ওর মাকে যেদিন সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হলো, সেদিন তার কি কান্না!—'আমি নিলুদার সঙ্গে যাবো।' নিলয় সেটা ভুলতে পারেনি। বড় হয়েও মাঝে মাঝে যোগাযোগ রেখেছে। ও পক্ষ থেকেই বরং সেটা ক্রমশ শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ তার এতবড় বিপদের খবর পেয়ে শুধু কাকার কথায় ছুটে যায়নি, নিজের ভিতর থেকেও একটা তাগিদ অনুভব করেছিল। গিয়ে যা বুঝল, ওদের আর ওখানে ফেলে আসা চলে না। গুটি তিনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে একটি তরুণী বিধবা যে কোন সময়ে বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই সামান্য যা কিছু আনা গেল, তাই সমেত ওদের বর্ধমানে কাকার বাসায় এনে তুলল।

ছুটি ফুরোতে তখন মাত্র দিন দুয়েক দেরি আছে। ওখান থেকেই চলে গেল চাকরি-স্থলে।

পরের সপ্তাহে যখন নিউ সাউথ পার্কের বাসায় এসে উঠল, সিঁড়ির মুখেই শিখার সঙ্গে দেখা। এত দিন পরে 'হঠাৎ উদয়' হওয়ার জন্যে তখনি দু-একটি অম্ল-মধুর মন্তব্য আশা করেছিল, যা তার নিয়ম। কিন্তু এ কী হলো! চকিতে একবার নিলয়ের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তখন বুঝতে পারেনি নিলয়। পরে বুঝেছিল। নিজেকে দিয়েই বুঝেছিল। সেই দিনই মালতী যখন ওকে নিজের ঘরে ডেকে

নিয়ে তাঁদের মনের একান্ত ইচ্ছাটুকু জানিয়ে দিলেন, তখন সেও একটি কথা বলতে পারেনি, শুধু উঠে এসে নত হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে বাইরের ঘরের দিকে যাবার পথেই শিখার ঘর। পরদাটা পুরোপুরি টানা ছিল না। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল রক্ত রং-এর এক টুকরো শাড়িব পাড়। তার নিচে দুখানি শুভ্র কোমল পায়ের পাতা, টেবিলের উপর আলগোছে ফেলে-রাখা একখানি নিটোল হাত। আড় চোখে এক পলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অথচ দুজনে দুজনের কত দিনের চেনা, কত সহজ ভাবে মিশেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সকলে মিলে আসর জমিয়েছে, দল বেঁধে বেড়াতে গেছে কত জায়গায়। নির্জনে দেখাশুনোও কম হয়নি। নিঃসঙ্কোচে কত গল্প করেছে পাশাপাশি বসে।

কিন্তু আজকের ঐ মুহূর্তটি আলাদা। যার জন্যে এতদিনের প্রতীক্ষা, যাকে ঘিরে কতদিনের কত আশা ও সংশয়ের ওঠা-পড়া, সেই ক্ষণটি যখন এসে দাঁড়ায়, উভয়ের মাঝখান থেকে অনিশ্চয়ের পাতলা মেঘখানা সরে যায়, তখনই কোথা থেকে যে একরাশ সঙ্কোচের কুয়াশা এসে দুটি মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, কেউ বলতে পারে না। সেই ক্ষণিকের আচ্ছাদনটুকু বড় মধুর।

নিলয় ইদানীং যখনই আসত সুনীতের ঘরে থাকত, যদিও সুবীরের ঘরখানা খালি পড়ে আছে, এবং সেখানেই তার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন মালতী। সুনীতই তাকে নিজের ঘরে টেনে এনেছিল। দুদিকে দুটি তক্তপোষ। অনেক রাত ধরে চলত ওদের কথার পালা। কখনো কখনো রাত ভোর হয়ে যেত, দুজনের কেউ জানতে পারত না।

আজ সুনীত নেই। নিলয় একা। বর্ষাকাল। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। এমনি রাতে, মন যখন কানায় কানায় পূর্ণ, তখনো তার গভীর স্তরে কিসের যেন একটা বেদনা-বোধ জেগে ওঠে। হয়তো

ঐ অশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে তার যোগ আছে। নিলয়ের চোখে ঘুম ছিল না। বাইরের বিশ্বে এবং তার অন্তর্লোকে যে সুর বাজছে, দুয়ে মিলে তার ভিতরের যে সুপ্ত শিল্পী তারও ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

মাথার কাছে দেওয়াল আলমারীর নিচের তাকে তার বেহালাটা পড়ে ছিল। সুনীত ও শিখার তাগিদেই আনতে হয়েছিল ওখানকার বাসা থেকে। দু-একবার বাজিয়েও শোনাতে হয়েছে। আজ কোনো শ্রোতা নেই। তবু হাত বাড়িয়ে টেনে নিল যন্ত্রটা। দু-একটি দীর্ঘ ছড়ের টান। সারা ঘরের রুদ্ধ বাতাস যেন আর্ত কণ্ঠে বিলাপ করে উঠল।

একখানা ঘর এবং একটি বারান্দার ব্যবধানে আর একটি ছোট্ট ঘরের স্তব্ধ অন্ধকারে আরেক জনের চোখেও অনেকক্ষণ ঘুম আসছিল না। একটি সূক্ষ্ম তন্দ্রা-জাল সবে তার নিমীলিত চোখদুটিকে ঢেকে দেবার আয়োজন করছে, এমন সময় কোথা থেকে ভেসে-আসা একটা সুরের মৃদু আঘাত সহসা তাকে ছিন্ন করে দিয়ে গেল।

বিছানার উপর উঠে বসল শিখা। স্বপ্ন নয়তো? কান পেতে রইল। বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে একটা উচ্চতান ছুটে এলো জানালা পথে। তার পরের যে মৃদু সূক্ষ্ম কোমল মূর্ছনা, সেটুকু আর শোনা গেল না। নিঃশব্দে জানলা খুলে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। সামান্য পথটুকু সন্তর্পণে পার হয়ে সুনীতের ঘরের খোলা জানালার কপাটের আড়ালে এসে দাঁড়াল। ভিতরে বসে যে শিল্পী বর্ষা-মুখর রাত্রির অন্ধকারে তন্ময় হয়ে সুরের আগুন ছড়িয়ে চলেছে, তাকে দেখা গেল না, অনুভব করা গেল শুধু তার মাথার দোলা, আঙুলের খেলা আর হাতের টান—কখনো লঘু, কখনো দ্রুত।

শিখা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তার দুহাত দূরেই দরজা। ফাঁক থেকে বোঝা গেল বন্ধ নয়, ভেজানো। ডাকবার প্রয়োজন ছিল

না। শুধু নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে একখানি কপাট খুলে, লঘু পায়ে ধীরে ধীরে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ানো। সে লোভ কি হয়নি? সে যে কত দুর্দম, সে কথা জানেন তার অন্তর্যামী। আর কেউ জানল না। এই সামান্য অন্তরালটুকু অক্ষুণ্ণ রইল। নিঃশব্দ-চারিণীর এই গোপন অভিসার গোপনেই রয়ে গেল।

॥ তের ॥

সেবার বড় বেশী বর্ষা নেমেছিল কোলকাতায়। শুভ কাজের আর দেরি নেই। শ্রাবণের শেষের দিকে দিন ফেলেছিলেন মালতী। মনে করেছিলেন, ততদিনে বৃষ্টির জোর কমে যাবে। কিন্তু লক্ষণ যেন অন্যরকম। অথচ বলতে গেলে, এইটাই তাঁর প্রথম কাজ, এ বাড়ির প্রথম উৎসব। এবার তো আর সবাইকে না ডেকে চলবে না। কেনই বা ডাকবেন না? তাঁদের এই একটি মাত্র মেয়ে। সেদিন বা তার আগের দিনগুলোতে যদি এমন দুর্যোগ দেখা দেয়, কেমন করে সামলাবেন?

এদিকে সুহৃদের একদণ্ড অবসর নেই। কারখানায় ডবল-শিফটে কাজ চলছে। কতকগুলো জরুরী অর্ডার রয়েছে, ঠিক সময়ে ডেলিভারী দিতে না পারলে সমূহ লোকসান। তার চেয়েও বড় কথা, বাজারে দুর্নাম হবে। তিনি সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে যান, ফিরতে রাত নটা বেজে যায়। শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। তার উপরে ওদিকের অত খাটনি এবং এদিকের উদ্বেগ।

বড় ছেলে তো থেকেও নেই। ছোট ছেলের থিসিস প্রায় তৈরী। এ সময়ে একটি দিন নষ্ট করা চলে না। বিয়ের দু এক দিন আগে ছাড়া আসতে পারবে না, আগেই জানিয়ে দিয়েছে। নিলয়কে তো আর এ ব্যাপারে ডাকা যায় না। তাছাড়া, সবে কিছুদিন হল লম্বা ছুটি থেকে ফিরেছে। একমাত্র রবিবার ছাড়া বেরোবার উপায় নেই। সেই যে এসেছিল পাকিস্তান থেকে ফিরে, তারপর আর আসেনি।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি। সকাল থেকে মাঝে মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছিল, বিকালের দিকে ক্রমশ বাড়তে লাগল। আকাশ জোড়া মেঘ। সঙ্গে হাওয়া আছে। মালতী ভাবছিলেন,

স্বামীর ফিরতে এখনো ঘণ্টা তিনেক। এদিকটায় জল জমে না, কিন্তু ওদিকের রাস্তাগুলো যদি ডুবে যায়, কেমন করে আসবেন?

হঠাৎ বাড়ির সামনে ভারী গাড়ি থামার শব্দ, সেই সঙ্গে লোকজনের আওয়াজ শুনে রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

একটা অ্যাম্বুল্যান্স এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বনাথবাবু বাড়ি থেকে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। একতলায় যে দোকান রয়েছে, তার থেকেও দু-তিন জন লোক ছুটে গিয়ে দাঁড়াল। অ্যাম্বুল্যান্স থেকে যারা নেমে পড়েছিল, তাদের মধ্যে কারখানার ফোরম্যান নিশিবাবু এবং আরো দু-একটি চেনা লোক দেখে মালতীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তে যা দেখলেন, আর নড়বার শক্তি রইল না।

সবাই মিলে ধরাধরি করে যাকে ওরা নামিয়ে আনছিল, তাঁর পা দু-খানাই আগে দেখতে পেয়েছিলেন। জুতো মোজা নেই, খালি পা। তার পরেই বেল বেজে উঠল। কে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল, তিনি জানেন না। হঠাৎ দেখলেন, বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রী— এগিয়ে আসছেন। তারপরেই তাঁর মাথাটা ঘুরে উঠল। চারদিকটা অন্ধকার হয়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল, চারদিক চেয়ে বুঝলেন, তাকে শিখার বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি। ঝুঁকে পড়ে বলল, এখন কেমন লাগছে, মাসিমা?

উনি কোথায়? বলে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন মালতী।

ও-ঘরে আছেন। আপনি আরেকটু শুয়ে থাকুন।

না, আমি যেতে পারবো।

দাঁড়াতেই পা দুটো টলে উঠল। অঞ্জলি এসে ধরে ফেলল এবং সেই ভাবেই ধীরে ধীরে নিয়ে গেল পাশের কামরায়।

সুহৃদ শুয়ে ছিলেন নিজের বিছানায়। চোখ দুটো বোজা।

মুখখানা থমথম করছে, যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। কোনো সাড়া নেই। একজন ডাক্তার—এই পাড়াতেই থাকেন বোধহয়, মাঝে মাঝে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছেন মালতী—পাশে বসে নাড়িতে হাত দিয়ে রয়েছেন। তার ঠিক পাশটিতেই দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বনাথবাবু। ডাক্তার তাঁর কানে কানে কী বলতেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। ঘর ভর্তি লোক। বাবার পায়ের কাছে গালে হাত রেখে নিচের দিকে চেয়ে বসেছিল শিখা। মায়ের সাড়া পেয়ে ছুটে গিয়ে দুহাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মালতী কী যেন বলতে গেলেন; পারলেন না। মেয়ের মুখখানা শুধু বুকে চেপে ধরলেন। দুচোখ থেকে অবিরল ধারা নেমে এলো। মিসেস সরকার দুজনকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। মৃদু স্বরে বললেন, ভয় নেই; হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এখনি ভালো হয়ে যাবেন।

ফোরম্যানের কাছে জানা গেল, কিছুদিন থেকে শ্রমিকদের সঙ্গে 'ওভার টাইম' নিয়ে একটু গোলমাল চলছিল। ঐদিন সকালেই টের পাওয়া গেল তাদের মতলব ভালো নয়। 'বাবু' কারখানার ভিতরটা একবার ঘুরে দেখে আফিসে এসে ওদের কজনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দু-একজন বেশ চড়া গলায় কথা বলছিল। ফোরম্যান খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ দেখল, ওঁর চোখ মুখ ভীষণ লাল হয়ে উঠেছে। টেবিলের উপর এক গেলাস জল ঢাকা দেওয়া ছিল। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন, কিন্তু হাতটা এত কাঁপছিল যে সে পর্যন্ত পৌঁছল না। তারপরেই চেয়ার সুদ্ধ বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। ওরা ছুটে গিয়ে টেনে তুলে দেখল, জ্ঞান নেই। ঘরের কোণে যে ইজিচেয়ারটাতে উনি বিশ্রাম নিতেন, তার উপর নিয়ে শুইয়ে দিল। কাছাকাছি কোনো ডাক্তার ছিল না। খানিকটা দূর থেকে একজনকে ডেকে আনা

হলো। তিনি এসে একটা ইনজেকশন দিয়ে বললেন, অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে বাড়ি নিয়ে যাও।

শুনে, এখানকার তরুণ ডাক্তার অজ্ঞাত সমব্যবসায়ীর উদ্দেশে যে বাণীটি নিক্ষেপ করলেন সেটা শ্রাব্য নয়। তারপর বললেন, তখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এখনো সেই চেষ্টা করতে বললেন।

মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করে বিশ্বনাথ গেলেন তাঁরই চেম্বার থেকে ফোন করতে। হাসপাতালের সঙ্গে অনেক কষ্টে যোগাযোগ করা গেল, কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্স বা ট্যাক্সি কিছুই পাওয়া গেল না। কোলকাতার রাস্তায় জল থৈ থৈ করছে। যানবাহন অচল। অগত্যা, ডাক্তার ওখানে যা কিছু সম্ভব সব করলেন, কিন্তু সারারাতের মধ্যেও জ্ঞান ফিরে এলো না।

পরদিন বেলা ছটা নাগাদ সুহৃদ চোখ খুলে তাকালেন। মালতী সেই রাত থেকে পাশে বসে। ঝুঁকে পড়লেন মুখের উপর। জানতে চাইলেন, জল খাবে ?

একটু যেন মাথা নাড়লেন মনে হলো। দু-তিন চামচে জল খেলেন আস্তে আস্তে। এদিক-ওদিক চাইতে চেষ্টা করলেন, যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না, কিংবা কাউকে হয়তো খুঁজছেন। মালতী বললেন, তুমি বাড়িতে তোমার বিছানায় শুয়ে আছো। খোকা আর সুনুকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।

আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই রুগীর চোখের পাতা নেমে এলো।

সুহৃদের আবাল্য বন্ধু ডাক্তার বিভূতি সেন দিল্লি গিয়েছিলেন। ঐ দিনই ফিরবার কথা। পাড়ার ডাক্তারই বারবার এলেন এবং আরো দুজন প্রবীণ অভিজ্ঞ ডাক্তারকেও ডাকা হলো পরামর্শের জন্যে। মালতীকে তাঁরা ভরসা দিলেন, কিন্তু বিশ্বনাথকে গোপনে বলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে কিছু

হয়তো করা যেত, এখন অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছে। ওষুধ, ইনজেকসনের ব্যবস্থা করে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার চোখ দুটো খুলে গেল। এদিক-ওদিক তাকালেন, জড়িয়ে জড়িয়ে দু-একটা কথাও বললেন, তার কিছুই বোঝা গেল না। বাঁ-হাতে কোনো সাড় ছিল না। ডান হাতের আঙুলগুলো উলটে যেন একটা হতাশার ভঙ্গী করলেন। আর কেউ না বুঝতে পারলেও মালতী বুঝলেন কী বলতে চান স্বামী। জীবনে যা কিছু করতে চেয়েছিলেন সব মাঝপথে অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রইল। কোনোটারই সুরাহা করে যেতে পারলেন না।

মালতী আর থাকতে পারলেন না ; তাঁর মনে সারাজীবন ধরে যত অভিমান সঞ্চিত হয়ে ছিল সব যেন এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো—ওগো, এখনো তুমি ঐসব কথা ভাবছ ? শুধু কাজ আর কাজ ! কী লাভ হল ? শুধু অকালে বেঘোরে—

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, আর কিছু বলতে পারলেন না।

কথাগুলো রোগীর কানে গেলেও দুর্বল মস্তিষ্কে পৌঁছল বলে মনে হল না। কিংবা হয়তো তিনি তখনো, যে চিন্তা তাকে পীড়া দিচ্ছিল, তারই মধ্যে নিমগ্ন হয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার যেন কাকে খুঁজতে লাগলেন। শিখা গিয়ে চোখের সামনে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ডাকল, বাবা।

সাড়া দিলেন না, কিন্তু মেয়ের মুখের উপর চোখ দুটো কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল।

শিখা বলল, বাবা, আমাকে কিছু বলবে ?

সুহৃদের কপালের উপর কতগুলো দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। জড়িত কণ্ঠে যা বললেন, তার থেকে একটা কথা যেন ছিটকে এসে-লাগল ওর কানে—আমার ফ্যাক্টরী······

মুহূর্ত মধ্যে কী যে হল শিখার মনে, সে জানেনা। সুদূরতম কল্পনায় ঘুণাক্ষরেও যা কোনোদিন ভাবেনি, তাই করে বসল। বিছানার পাশে বসে পড়ে বাবাকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। মুখ নামিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, বাবা, তুমি ভেবোনা। তোমার ফ্যাক্টরীর সব ভার আমি নিলাম।

সুহৃদ শুনতে পেয়েছেন, বোঝা গেল। তাঁর দুচোখ ভরা বিস্ময়। তেমনি অস্পষ্ট ভাবে থেমে থেমে বললেন, তুমি! তুমি কি পারবে, মা?

কেন পারবো না? তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর, বাবা—বলে মাথাটা নামিয়ে দিল বাবার বুকের উপর। তার উপরে কম্পিত হাতখানা রেখে সুহৃদ মৃদু কণ্ঠে কী যেন বললেন, শোনা গেল না। কিন্তু সেখানে যারা যারা ছিল স্পষ্ট দেখতে পেল, তাঁর কপালের উপরকার সেই রেখাগুলো মিলিয়ে গেছে।

শিখা যখন মুখ তুলল, তার মনে হল, বাবার রোগ-সন্তপ্ত মুখের উপর একটি পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ আভা ভেসে উঠেছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব শেষ।

শিখাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বিশ্বনাথ সরকার তার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলেছিলেন, তুমিই প্রকৃত ছেলের কাজ করলে মা। ঐ আশ্বাসটুকুর জন্যেই বোধহয় প্রাণটা আটকে ছিল।

শিখার চোখে জল ছিল না। নত হয়ে তাদের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী পিতৃতুল্য বৃদ্ধকে প্রণাম করল।

একে একে সকলেই এসে পৌঁছল। প্রথমে এলেন ডাক্তার সেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বললেন, আমারই উচিত ছিল আরেকটু জোর করা। কিন্তু আমিও বুঝতে পারিনি এত শীগগির চলে যাবে।

তারপরে এলো নিলয়। সেই সব চেয়ে কাছে থাকে। ছেলেদের আসতে আরো দেরি হবে। তাই মালতীর অনুমতি নিয়ে শেষ সময়ের সব কাজ তাকেই করতে হলো। মুখাগ্নি করল মেয়ে।

সুবীর এলো সুনীতের কিছু পরে—একা। তা নিয়ে বাড়ির কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। বিশ্বনাথ বললেন, বৌমাকে রেখে এলে কেন বাবা ?

সুতপা ছিল প্রসূতি-সদনে। কোলে আটদিনের ছেলে। সুবীর সে কথা চেপে গেল। বলল, তার খুব অসুখ, হাসপাতালে আছে।

মৃত্যু-সংবাদ পাবার পর উইল নিয়ে এলেন অ্যাটর্নী। উইলের কথা কাউকে জানাননি সুহৃদ, মালতীকেও না। এবার সবাই জানলো। ফ্যাক্টরী দিয়ে গেছেন দুই ছেলেকে, আধাআধি ভাগ। নিজের যে দুটো জীবনবীমা ছিল, তা পাবেন স্ত্রী আর মেয়ে। মেয়ের দরুন যেটা, তার মেয়াদ আগেই শেষ হয়েছে। টাকাটা আলাদাভাবে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। একজিকিউটর করে গেছেন মালতীকে। তাঁর উপর নির্দেশ রয়েছে, ঐ টাকা বা তার যে কোনো অংশ শিখার বিয়েতে খরচ করতে পারবেন। যদি কিছু বাকী থাকে, সেটা তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। সাবালিকা হবার পর সে যদি অবিবাহিতা থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, সব টাকাটাই তার প্রাপ্য।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাবার পর সুবীর ভাইকে ডেকে বলল, আমার নিজের বিজ্‌নেস্‌ রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য অনেক কারণে, এখানে এসে ফ্যাক্টরী চালাবার ইচ্ছা আমার নেই। সে সময় বা সুযোগ কখনো হবে না। তাই বলছিলাম, তুই বরং আমার শেয়ারটা কিনে নে। তা না হলে ওটা অন্যত্র বিক্রী করতে হবে। তাতে তোরই অসুবিধা।

সুনীত আকাশ থেকে পড়ল, ও বাবা! আমার টাকা কোথায় যে তোমার শেয়ার কিনতে যাবো?

তাহলে অন্য খদ্দের দেখি। আমার বেশ কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে।

কথাটা শিখার কানে যেতেই সে বলল, দামের হিসেব কর, টাকা আমি দেবো।

'বেশ'; বলে সুবীর ফ্যাক্টরীতে গিয়ে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টকে নিয়ে ফ্যাক্টরীর দাম কষতে লেগে গেল।

সুনীত এসে ধরল বোনকে, তুই যে দাদার অংশ কিনে নিতে চাইছিস, টাকা কোথায় পাবি?

কেন, টাকা তো আমাকে বাবা-ই দিয়ে গেছেন।

হ্যাঁ; কিন্তু ফ্যাক্টরীর পেছনে খরচ করবার জন্যে দেননি।

এই রকম একটা অবস্থা দেখা দেবে, তিনি কেমন করে জানবেন?

এখনো ভালো করে ভেবে দ্যাখ, খুকু। তোর বিয়েতে কিছু খরচ-পত্তর আছে। আমার রোজগার তো জানিস।

ছোড়দা, তুমি জানো না, এ দিকটা নিয়ে আমি তিনদিন থেকে ভাবছি। এ ছাড়া আর পথ নেই। তুমি বাধা দিও না লক্ষ্মীটি, আর মা যদি আপত্তি করে, আমার পেছনে একটু দাঁড়িও।

মা আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু মেয়ের মুখ দেখেই বুঝলেন, তাকে ঠেকানো যাবে না। সুনীতও তাঁকে বারণ করল। আর একটা কথা ভাবলেন মালতী—এক বছর কালাশৌচ, তার মধ্যে বিয়ে হতে পারবে না। ততদিনে তাঁকে যা দিয়ে গেছেন উইলে, সেটা হাতে এসে যাবে। তার থেকেই বিয়ের খরচপত্র চালাবেন। ওটা ওর টাকা, ও যা করতে চায়, করুক।

সুবীর চলে গেল। এই আশ্বাস নিয়ে গেল, যে মাস দুয়েক পরে অর্থাৎ উইলের প্রোবেট ইত্যাদি নেবার পর টাকা হাতে এলে,

আরেকবার এসে তার প্রাপ্য বুঝে নিয়ে দলিল করে দিয়ে যাবে।

সুনীতকেও ফিরে যেতে হবে। তার গবেষণা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পরের পর্ব অনিশ্চিত। কোথায় কী জুটবে কেউ বলতে পারে না।

যাবার আগে ক'দিন তাকে খানিকটা ঘোরাঘুরি করতে হলো। মালতী বেশীরভাগ সময় প্রায় নিজের ঘরেই শুয়ে থাকেন। আগের মত ছেলেমেয়েরা কখন কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, অতটা খোঁজ রাখেন না।

শিখা একদিন বলল, সারাদিন কোথায় থাকো, বল তো।

একটু কাজ ছিল।

এখানে আবার তোমার কী কাজ?

সেটা বোঝা গেল তার ফিরে যাবার আগের দিন। বোনের ঘরে গিয়ে একটা লম্বা খাম তার হাতে দিয়ে বলল, এটা রেখে দে?

কী এটা?

পরে এক সময় পড়ে দেখিস।

মুখ-খোলা খাম। ভিতর থেকে বেরোল দু-শীট ভাঁজ করা পুরু কাগজ। ভাঁজটা খুলে শিখা অবাক হয়ে গেল, ওমা! এ যে একটা দলিল বলে মনে হচ্ছে!

আর বলিস না! বিষয়-সম্পত্তি এমন জিনিস, যে মুখের কথার কোনো দাম নেই, সব কিছু ঐ দলিলে ঢোকাতে হয়।

ব্যাপার কী ছোড়দা!

সুনীত বোনের কাঁধে হাত রাখল। অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বলল, আমার সব কথাই তো তুই জানিস। বাবাও জানতেন। তবু কেন যে আমার ঘাড়ে তাঁর ফ্যাক্টরীর বোঝা চাপিয়ে গেলেন? আমি ওর কী বুঝি, বল? অর্ধেকটা তো

তোকে এমনিতেই বইতে হচ্ছে। বাকীটাও নে ভাই, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

বুঝেছি; তোমার অংশটা আমাকে দান করছ—গম্ভীরভাবে বলল শিখা।

মোটেই না; বরং তার উলটো। তুই যদি এটা নিয়ে নিস, আমি মনে করবো আমাকে একটা কঠিন ভার থেকে মুক্তি দিলি। আমার কথাটা বুঝে ছ্যাখ, খুকু।

যেন ভিক্ষা চাইছে এমনিভাবে বোনের হাত ছুটো ছুহাতে জড়িয়ে ধরল সুনীত।

তুমিও যদি ছেড়ে দাও, আমি একা কী করে চালাবো? হতাশার সুরে বলল শিখা।

"একা আর কদিন?"—সুনীতের কণ্ঠে আবার হালকা সুর ফিরে এলো, "চালাবার আসল ব্যক্তিটি এসে পড়লে আর ভাবনা থাকবে না।"...বলে ওর কাঁধটা ধরে নেড়ে দিল।

এর পরে বোনের মুখে একটি সলজ্জ আনন্দের আভাস অন্তত আশা করেছিল সুনীত। না পেয়ে অবাক হ'ল।

শিখা আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইল।

॥ চৌদ্দ ॥

শ্রাদ্ধের সময় নিলয় এসেছিল। ভোর বেলা পৌঁছেই কাজে লেগেছিল এবং রাত বারটা পর্যন্ত কোনোদিকে তাকাতে পারেনি। কারো সঙ্গে দুটো কথাবার্তাও হয়নি। রাত থাকতেই আবার হাওড়ায় ছুটেছিল গাড়ি ধরতে। একদিনের বেশী ছুটি পায়নি। তার পরেও কতগুলো রবিবার নানা কাজে আসবার সময় হয়নি। এবার একদিন সুযোগ করে এল।

মালতী এতদিনে নিজেকে অনেকটা শক্ত করে এনেছেন। এখনো তাঁর কত কাজ বাকী। তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান, শিখার বিয়ে। একটা বছর আর কদিন। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিন্তু মেয়ের ভাবগতিক দেখে তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। এ কী মেয়ে! একেবারে ঠিক যেন বাপের ছায়া! মুখের আদল তো বটেই,—সেটা যে দেখে সেই বলে—স্বভাবও প্রায় তাঁরই মত। তেমনি ফ্যাক্টরী নিয়ে মেতে উঠেছে। ঐটাই এখন তার ধ্যান, জ্ঞান। অথচ দুদিন পরে তাকে পরের ঘরে যেতে হবে। ভাবছিলেন, নিলয়কে তার মনের উদ্বেগটা জানাবেন। তার আগে মেয়ে তাকে আরো অবাক করে দিল।

নিলয় এসেছিল শনিবার রাত্রে। রবিবার সকালে চায়ের পাট মিটতেই শিখা মায়ের কাছে গিয়ে বলল, মা এবার তোমার আসল কাজটা করে ফেল।

আসল কাজ মানে?

নিলয়দা কেন অপেক্ষা করে বসে থাকবে? ওকে সব কথা জানিয়ে দেওয়া ভালো।

"কী সব কথা!"—মালতীর চোখে শঙ্কার ছায়া ফুটে উঠল।

"আমি যে পথে নামলাম, সেখানে তো আর সানাই-এর জায়গা নেই।" হাসিমুখে তরল সুরে বলল শিখা, "তার দুধারে শুধু কলের ভেঁপু।"

মা রেগে উঠলেন, হেঁয়ালি রেখে পষ্ট করে বল।

শিখা বলল, পষ্ট করেই বলেছি মা। তুমিও যে বোঝনি, তা নয়। এবার শুধু আরেক পা এগিয়ে গিয়ে ওকে বোঝাতে হবে। সেটা কিছুমাত্র কঠিন নয়। ওর বুঝতে দেরি হবে না।

"এসব তুই কি বলছিস, খুকু?" মালতীর মনের গভীর আশঙ্কা তার কণ্ঠেও ধরা দিল, "এতদূর এগোবার পর এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবো!"

কী করবে বল? একটা মৃত্যু যে সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়ে গেল।

তার জন্যে বিয়ে বন্ধ হবে কেন? বরং নিলয় তোর পাশে এসে দাঁড়াবে। ওরই ওপরে সব ছেড়ে দিতে পারবি।

শিখা কয়েক সেকেণ্ড কী ভাবল। তারপর বলল, মা তোমার মনে আছে? একদিন বাইরের ঘরে বসে বাবাতে আর তোমাতে আমার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি ছোড়দার ঘর থেকে লুকিয়ে সব শুনেছিলাম। বাবার একটা কথা কোনদিন ভুলবার নয়। বলেছিলেন, বিয়ে হবার পর মেয়ে আর মেয়ে নয়, সে স্ত্রী, সে বৌ। এর চেয়ে খাঁটি সত্য আর হতে পারে না। তার চেয়েও বড় সত্য—এ দুয়ের মধ্যে কোন আপোস চলে না। ঘটনা-চক্রে আমাকে মেয়েই থেকে যেতে হল। পরের ধাপটায় আর পৌঁছনো গেল না।

মালতী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন, তুই কী নিয়ে থাকবি হতভাগী? সারাটা জীবন কাটাবি কেমন করে?

মালতী বসেছিলেন খাটের উপর। শিখা মেঝের উপরে তাঁর পায়ের কাছটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বাঁ-হাতে মায়ের কোমর জড়িয়ে

ধরল। কোলের উপর মুখ রেখে ডান-হাতে তাঁর হারের লকেটটা নাড়াচাড়া করতে করতে করুণ কোমল সুরে বলল, মা, তুমি এমন করে ভেঙ্গে পড়লে, আমি কার দিকে চাইব? তুমি আমাকে বল দাও, সাহস দাও। নিজের চোখেই তো দেখলে আমি যখন কথা দিলাম, বাবা কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষ সময় যে আশ্বাস তিনি নিয়ে গেলেন, সেটা কি আমাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে পূরণ করতে হবে না? তার চেয়ে বড় হল আমার বিয়ে! মা, মেয়ে বলে তুমি আমাকে ছোটো করে দেখো না। বাবার মত তুমিও আমাকে আশীর্বাদ কর। তাঁর সৃষ্টি আমি নষ্ট হতে দেবো না।

মালতী মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। মনটা একটু শান্ত হবার পর চোখ মুছে বললেন, এতবড় একটা কঠিন আঘাত নিলয়কে আমি দেবো কেমন করে? তারপরেও কি ওর কাছে আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে?

সে জন্যে তুমি ভেবো না মা। ওর মনটা যে কত বড়, তা তো জান। আঘাত পাবে, কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠবার শক্তিও ওর কারো চেয়ে কম নেই।

শিখার এই প্রত্যাশাটা বোধহয় একটু সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল, নিলয় পাষাণ নয়, সে মানুষ। তবু মালতীর মুখ থেকে শেষ জবাব পাবার পর, ভিতরে যাই হোক, বাইরে তার কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়নি। মালতীই বরং নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি, বলতে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। নিলয় তাঁকে প্রবোধ দিয়েছিল আপনি, এজন্যে কিছু মনে করবেন না মাসিমা। আমি সব বুঝতে পারছি।

ট্রেনের তখনো দেরি ছিল। তবু একটু আগে আগেই বেরিয়ে পড়েছিল নিলয়। একবার ভেবেছিল, যাবার সময় অন্যান্য বারের মত শিখার সঙ্গেও দেখা করে যাবে। পাছে তার সামনে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তাই শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা ত্যাগ করেছিল।

শিখাও তার ঘর থেকে বেরোয়নি। হয়তো ঐ একই কারণে। যত শক্ত করেই বুক বাঁধুক, শেষ মুহূর্তে যদি না টেকে? অবাধ্য চোখ দুটো যদি বাদ সাধে? যদি সব সংকল্প ভাসিয়ে নিয়ে যায়?

ট্রেনে বসে নিলয় নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল—এ ভালোই হলো। সংসারে সে শুধু পরের বোঝা বইতে এসেছে, এই তার বিধিলিপি। আর কেউ এসে তার নিজের ভাবনাটুকু তুলে নেবে, সেটা বিধাতার ইচ্ছা নয়। কিন্তু তাকে নিয়ে তাঁর এই পরিহাসের কী প্রয়োজন ছিল? এতদিন সে ছুটে গিয়েছে অন্যের ঘর গুছিয়ে দিতে, অন্যের সংসারে দাঁড় টানতে। বাকী জীবনটাও না হয় তাই করে যেত। মাঝখানে এই নিজের ঘর, নিজের সংসারের অলীক স্বপ্ন তাকে পেয়ে বসল কেন? আজকের এই লজ্জা সে রাখবে কোথায়?

নিজের কাছে নিজেকে বড় দীন, বড় কৃপার পাত্র বলে মনে হ'ল নিলয়ের। কাউকে কোনো দোষ দিতে পারল না। শিখাকে তো নয়ই। তবু বুকের ভিতরটা জ্বালা করতে লাগল। সংসারে না পাওয়ার যে দুঃখ তাকে সয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু পাবার মুখে হারাবার যে যন্ত্রণা, যে লাঞ্ছনা, সেটা বড় দুর্বিসহ।

ষ্টেশনে পৌঁছবার আগেই নিলয়ের মনে একটা অদ্ভুত বিবর্তন ঘটে গেল। এবার আর কারো ঘরেব সঙ্গে বা জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়ানো নয়। আজ থেকে সে একা। চিরকাল সে শুধু অন্যের ডাক শুনে এসেছে। একটিবার মাত্র একজনকে মনে মনে ডাক দিয়েছিল, সাড়াও পেয়েছিল। কিন্তু সে এলো না, নাই যদি এলো, তবে 'একলা চলরে।' আজ থেকে এই তার জীবন-দর্শন।

এখানকার চাকরির উপর সে আগেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তবু ছাড়ব ছাড়ব করেও ছাড়তে পারেনি। আজ আকস্মিক ভাবে তার সুযোগ এসে গেল। বণ্ডের মেয়াদ আগেই শেষ হয়ে গেছে, তবু ইস্তফা দিতে গেলে এক মাসের নোটিশ চাইবে কোম্পানী।

ততদিন বসে থাকবার ধৈর্য আর নেই। তাছাড়া কাজ করবার জন্যে মনের যে স্থিরতা, যে শৃঙ্খলা দরকার, তাই বা কই? ভিতরটা সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে। সেই রুটিন বাঁধা জীবনে ফিরে যেতে হবে, ভাবতেও ভয় হয়। না, এখন শুধু কোনোরকমে ছুটে বেরিয়ে পড়া। এমন জায়গায় গিয়ে পড়ে থাকা, যেখানে একটাও চেনা মুখ নেই, যেখানে কেউ এসে জানতে চাইবে না, কেমন আছ।

নিলয় মনে মনে হিসাব করে দেখল, এখনো মাসখানেক ছুটি পাওনা আছে। কিন্তু চাইতে গেলে দেবে না, সি. ঈ. আপত্তি করবেন। তার চেয়ে এক কাজ করা যাবে। যাবার দিন ঐ ছুটির জন্যে ডাকে একখানা দরখাস্ত ছেড়ে দেবে, সেই সঙ্গে চাকরি ছাড়ার নোটিশ।

দু-তিন দিন গেল এখানকার বাস গোটাতে। চাকরটিকে এক মাসের বেশী মাইনে দিয়ে বিদায় করে দিল। আসবাবপত্র সামান্য যা ছিল, বিলিয়ে দিতে গেলে নানা কথা উঠবে। তাই ছুটির পর এসে নেবো বলে কোনো বন্ধুকে গছিয়ে দিল। তারপর বেরিয়ে পড়ল স্টেশনের পথে।

কোথায় যাবে তখনো ঠিক করেনি। দুটো জিনিস ভেবে রেখেছিল নিশ্চয়—জায়গাটা হবে অনেক দূর এবং যতটা সম্ভব নির্জন। অনেকদিন আগে একবার মাকে নিয়ে হৃষীকেশ গিয়েছিল। বড় ভালো লেগেছিল—একদিকে অরণ্য-সংকুল হিমালয়ের গাম্ভীর্য, আরেকদিকে উপল-ব্যথিত গঙ্গার অস্থিরতা। মানুষ সেখানে ভিড় জমিয়ে বসেনি।

হরিদ্বার হয়ে যেতে হয় হৃষীকেশ। তারই টিকেট চাইল। টিকিটবাবু বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এদের টিকেট-গুলো দিয়ে নিই। আপনার ওটা বানাতে হবে। গাড়িরও দেরি আছে।

ওয়েটিং রুমে এসে বসতেই চাকরটি ছুটতে ছুটতে এসে একটা চিঠি দিয়ে বলল, আপনি বেরোবার একটু পরেই পিওন দিয়ে গেছে।

হাতের লেখা দেখেই বুকের ভিতরটা নড়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে প্রথম লাইন দুটো পড়েই সারা দেহে যেন একটা তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে গেল।

"তুমি আমাকে একা ফেলে চলে গেলে নিলয়দা? যাবার আগে একবার এসে দাঁড়ালে না আমার কাছে, জানতে চাইলে না, কী বলতে চায় শিখা?"

এইখানে এসেই থেমে গেল নিলয়। বুঝতে পারল না, এ কিসের ইঙ্গিত। সমাপ্তির রেখা যেখানে টানা হয়ে গেল, তার পরে বলবার বা শোনবার আর কী থাকতে পারে? কিন্তু এমন একটা সুর ছিল এই কটি কথার মধ্যে, যার টানে পরমুহূর্তেই আবার সে ফিরে গেল বাকী লাইনগুলোয়—

"যে বন্ধন আমাদের গড়ে উঠতে গিয়েও উঠল না, শেষ ধাপে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এসে যাকে থামিয়ে দিল, দুটি নরনারীর জীবনে—হলই বা তারা তরুণ তরুণী—সেইটাই কি একমাত্র মিলন-গ্রন্থি, নিলয়দা? তার মত দৃঢ়, তার মত মধুর আর কিছু নেই?

আমাদের ভালবাসা যদি সত্য হয়, সে কি শুধু এই জন্যে ব্যর্থ হয়ে যাবে, যে একটি বিশেষ সম্পর্কের মধ্যে এসে তার পরিণতি ঘটল না?

তোমার মনে পড়ে একবার আমরা কোথায় যেন একটা দীঘির ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম? অনেক পদ্ম ছিল দীঘিটায়, একজন লোক সেগুলো তুলছিল। তুমি তার কাছ থেকে এক গোছা কুঁড়ি কিনে এনে আমার হাতে দিয়েছিলে। আমি বলেছিলাম, দু-চারটা ফোটা ফুল নিলে না কেন? তুমি বলেছিলে, পদ্ম ফুটলেই তো

গেল। তার চেয়ে এই কুঁড়ির মধ্যেই তাকে বেশী করে পাওয়া যায়।

আমাদের ভালবাসা না হয় চিরদিন সেই কুঁড়ি হয়েই রইল। সব কুঁড়ি তো ফোটেনা। তাই বলে সে কি অসার্থক?

না ই বা হলে তুমি আমার স্বামী, আমার 'জীবন-বল্লভ', না-ই বা হলাম আমি তোমার শয্যা-সঙ্গিনী, কবি যাকে বলেছেন' গৃহের বনিতা', তাই বলে যে নিলয়-শিখা এতদিন ধরে একে অন্যকে চিনল, জানল আশা নিরাশায়, আনন্দে-বিষাদে এত কাছে এসে দাঁড়াল, চিরজীবনের তরে তারা মিথ্যা হয়ে যাবে?

তুমি তো জান নিলয়, কেন আমাকে এই একক জীবন বেছে নিতে হলো। কিন্তু একক মানে তো বিচ্ছিন্ন নয়। তুমি থাকবে তোমার জগতে তোমার কাজ নিয়ে, আমি থাকব আমার জগতে আমার কাজ নিয়ে। সেই কর্মসূত্রে আমাদের মিলন হবে—আমাদের চিন্তা ও আদর্শ যেখানে বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে, সেই যজ্ঞশালায়। সেখানে আমরা দুজনে দুজনের কর্ম-সহচর।

কাজের বাইরে যে জীবন সেখানেও কি আমরা মিলিত হতে পারি না? সারাদিনের শ্রান্তিভার নামিয়ে দিয়ে তুমি এসে বসবে আমার কাছে, কখনো আমি গিয়ে বসবো তোমার পাশটিতে। কোনোদিন বা দুজনে মিলে চলে যাবো দূরে, সহরের বাইরে। তুমি তোমার বেহালায় সুর দেবে, আমি মুখোমুখি বসে শুনবো। আমি তো গাইতে জানি না। তোমাকে কী শোনাবো? কেন, আমার কথা? মনে আছে একদিন কী বলেছিলে?—'তোমার কথাগুলোই গান!' সেই গান শুনবে। যতক্ষণ ইচ্ছা হয়।

আমাদের সেই প্রীতিময় সাহচর্য কর্মান্তের অবসরকে দেবে মাধুর্য, বিশ্রামকে করবে রমণীয়।

তারপর যখন রাত্রি হবে, তুমি চলে যাবে তোমার আস্তানায়,

আমি চলে আসবো আমার এই ছোট্ট ঘরটিতে, যেখানে বসে তোমাকে চিঠি লিখছি।

আমার কথা কি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি নিলয় ?

তোমার আসার পথ চেয়ে রইলাম।

তোমার শিখা।"

চিঠি যখন শেষ হল, তারপরেও অনেকক্ষণ নিলয় সেই ওয়েটিংরুমের বেঞ্চিতে চুপ করে বসে রইল। হঠাৎ কোথাকার কোন গাড়ির ঘন্টা কানে যেতেই চমক ভেঙে উঠে দাঁড়াল। টিকেট কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াতেই ওধার থেকে সেই বাবুটি বললেন, এই যে, এবার আপনার টিকিট দিচ্ছি। হরিদ্দারের ভাড়া হল—

নিলয় বলল, হরিদ্দার নয়, একখানা হাওড়ার টিকেট দিন।

টিকিটবাবু রেল ভাড়ার তালিকা দেখছিলেন। তার থেকে মুখ তুলে একটু অবাক হয়ে তাকালেন।

সমাপ্ত